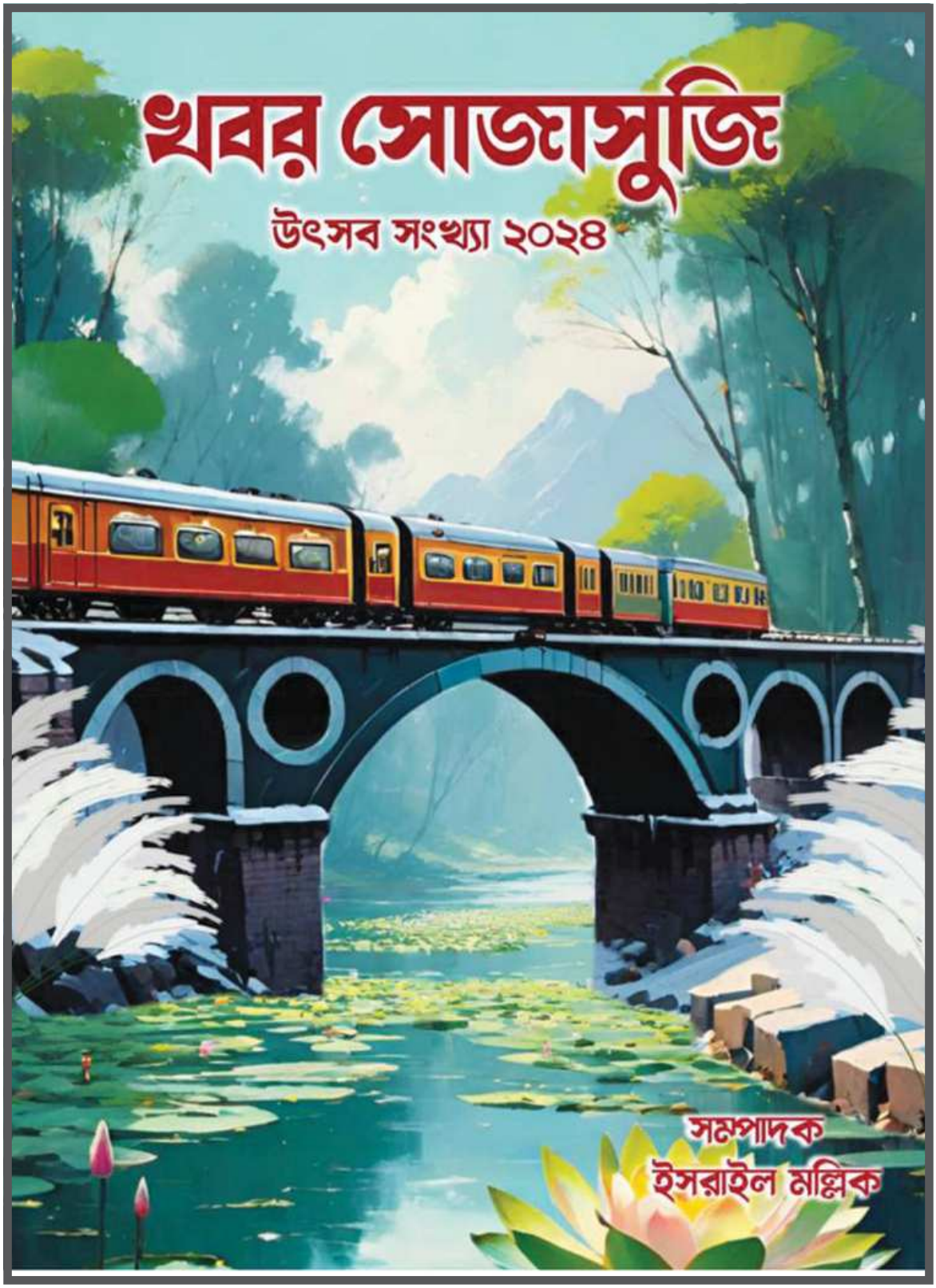
খবর সোজাসুজি
উৎসব সংখ্যা ২০২৪
সম্পাদক
ইসরাইল মল্লিক

ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি

উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পথে

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারবো করে দেখাবো

আমাদের লক্ষ্য

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রাকে একশো ভাগ পূরণ করার জন্য আমরা অঙ্গিকার বদ্ধ।
- আমরা চাই বিশেষ মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক মর্যাদার মান উন্নয়নের পথ দেখাতে।
- খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবদের উন্নয়নমুখী করার প্রচেষ্টাও আমাদের থাকবে।
- যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, আমার ঠিকানা, নিজ ভূমি নিজ গৃহ ও মিশন নির্মল ভারত বিভিন্ন ভাতা প্রদান, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সমাজসাথী জীবন বীমা প্রদান।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদান।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণীমিত্রা কর্মসূচীকে স্বার্থক রূপ দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

সৌমেন ঘোষ	রাজর্ষি চক্রবর্তী	অর্পিতা বারিক
সহ সভাপতি	কার্যনির্বাহী আধিকারিক	সভাপতি

গুড়বাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পাশে

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

আমাদের লক্ষ্য—

১। সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, ২। শিক্ষাশ্রী প্রকল্পে সফলতা, ৩। তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ৪। সুসংহত শিশু বিকাশ, ৫। ঘরে ঘরে শৌচাগার, ৬। সকলের জন্য নিরাপদ পাণীয় জলের ব্যবস্থা ও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা ৭। কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী এবং সবুজ সাথীর মতো প্রকল্পগুলি উপভোক্তাদের কাছে পৌছে দেওয়ার সহযোগিতা করা, ৮। নির্মল বাংলা গড়তে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

কৌশিক ঘোষ
উপপ্রধান
গুড়বাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

চন্দনা মালিক
প্রধান
গুড়বাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

KHABOR SOJASUJI UTSAV SANKHYA 2024
RNI No. WBBEN/2023/87806 (Govt. of India)

সৌমেন ঘোষ

সভাপতি

ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

সহ-সভাপতি - ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick, Published from Vill- Mathurapur, P.O- Shiptai, PS- Jamalpur Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308 State- West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27No. Laskardighi West (Near Rongtuligoli), Burdwan Pin- 713101
Editor- Israil Mallick, Mob- 9434566498 Email- khaborsojasuji@gmail.com

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন –

অসীমা পাত্র

বিধায়ক, ধনেখালি বিধানসভা

দশঘরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পাশে

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

আমাদের লক্ষ্য—

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা। ২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করা। ৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ৪। জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান। ৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

শংকর কুমার সাহা
উপপ্রধান
দশঘরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

চম্পা বাউড়ী
প্রধান
দশঘরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

খবর সোজাসুজি

উৎসব সংখ্যা ২০২৪

KHABOR SOJASUJI

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

স্বত্বাধিকারী,মুদ্রক ও প্রকাশক - ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক ঃ ইসরাইল মল্লিক
মুদ্রণ সহযোগী - বর্ষা পাবলিকেশন
বিন্যাস ও অলংকরণ - জয়ন্ত দত্ত
প্রচ্ছদ শিল্পী - সুরজ শেঠ

খবর সোজাসুজি'র পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা —

প্রকাশক, খবর সোজাসুজি

খবর সোজাসুজি'র পক্ষে ইসরাইল মল্লিক কর্ত্তৃক গ্রাম -মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, থানা- জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮ পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা

Mobile - 9434566498, E-mail-khaborsojasuji@gmail.com

উৎসব সংখ্যা ২০২৪

সূচিপত্র

ছোটগল্প	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
১.গণেশের হালখাতা - রমাকান্ত পাঁজা-	১১	১২. সিঁড়ি - বাবলু কাজি-	৫১
২.এক আদুরীর কথা - রথীন্দ্রনাথ রায় -	১৪	১৩. দুর্দশা - মানিক চন্দ্র সৌ-	৫২
৩.বন্ধুত্বের শারদোৎসব - ঋতম পাল -	১৬	**প্রবন্ধ**	
৪.ফণীরানী - প্রভাস পাল-	১৮	১.রবীন্দ্রনাথ-বিশ্বের কবি, বিস্ময়ের কবি - সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় -	৫৩
৫.জীবন বদলের গল্প - সমাদৃত দাস -	১৯	২.আগামী প্রজন্ম - অবিনাশ ব্যানার্জী -	৫৬
৬. কাছের মানুষ - মিলি ঘোষ -	২১	৩.শওকত আলি - শংকর ব্রহ্ম-	৫৮
৭.হিমায়িত মন - তপন তরফদার -	২৩	৪.এক প্রধান শিক্ষকের অপ্রকাশিত জীবনী - প্রকাশমান বসু -	৬১
৮.কাদম্বরীর ভূত - মিঠুন মুখার্জি -	২৫	**ভ্রমণ কাহিনী**	
৯.অমলের বন্ধু - পার্থ প্রতিম গোস্বামী -	২৭	১.এক আতঙ্কের সফর - সুরঞ্জন দেব -	৬২
১০.পাঁঠাবলি - রঞ্জন কুমার ব্যানার্জী -	২৯	২.ভয়ানক রাত - স্নেহা মল্লিক -	৬৪
১১.ভূত দেখা - কল্যাণ সেনগুপ্ত -	৩০	**মুক্ত গদ্য**	
১২.বিপ্লব - একটি পাখির নাম- শাশ্বত বোস -	৩২	১.একটি তারার আলো - সুচরিতা চক্রবর্তী -	৬৫
১৩.কৃষ্ণবনে কুহেলিকা - আহমদ রাজু -	৩৪	২.আডোনিস-সিরিয়ার কবিতা -তন্ময় কবিরাজ -	৬৬
১৪. তুলসী - মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় -	৩৬	**রম্য রচনা**	
১৫.অসূয়া - রবীন বসু -	৩৭	১.এসো সুন্দর হই - সজল চক্রবর্তী -	৬৯
১৬.স্মৃতি তর্পণ - লাজবী মুখার্জী -	৩৯	২.জারা হটকে জারা বচ্ কে - ড. সুপ্তি সরদার -	৭০
১৭. সম্পত্তি সমর্পণ - বিজন গঙ্গোপাধ্যায় -	৪১	**কবিতা ও ছড়া**	
১৮.পদ্মকলি - গোপালী গঙ্গোপাধ্যায় -	৪৪	১.খবর পারে - সুনীতি মুখোপাধ্যায় -	৭১
অনুগল্প		২.খাঁটি ভূত - বিজন দাস -	৭১
১.মৃতের বিড়ম্বনা - পার্থ পাল -	৪৫	৩.অনলাইন - সুব্রত মিত্র রানা -	৭২
২.গরিবীয়ানার দোষ - মায়া সাহা -	৪৬	৪.আমার শরৎ - বিজুরিকা চক্রবর্তী -	৭২
৩.মানবতা - পার্থসারথি মহাপাত্র -	৪৭	৫.আমি দ্রৌপদী নই - অরুণকুমার মান্না-	৭২
৪.একমেবাদ্বিতীয়ম - ছন্দা দাম -	৪৭	৬.প্রতিবেশী - নাজমুল কবির -	৭৩
৫.গাধাতন্ত্র - মাখনলাল প্রধান-	৪৮	৭.ভোলার স্বপ্ন - সুজন দাশ -	৭৩
৬.হড়পা বান - চন্দ্রানী মজুমদার -	৪৮	৮.পরম্পরা - তপন কোলে -	৭৩
৭.ফ্রেঞ্চ ফ্রাই - সন্দীপ যাযাবর দত্ত -	৪৯	৯.হৃদয়ের আলপথে - তুষার ভট্টাচার্য -	৭৪
৮.সরি স্যার - প্রশান্ত গিরি -	৪৯	১০.সময়ের নিরিখে -ডাঃ সেখ সাবের আলি -	৭৪
৯.পরিণতি - জিনিয়া কর -	৫০	১১.কবিতা সত্যিই সৃষ্টি হয় - সুফি রফিক উল ইসলাম -	৭৪
১০.এসো হে বৈশাখ - সুজয় সাহা-	৫০	১২.দেখা-অদেখায় - প্রদীপকুমার সামন্ত -	৭৫
১১.জোরের কলম - মনোরঞ্জন ঘোষাল -	৫১	১৩.চাঁদের হাসি - রাসমণি ব্যানার্জী-	৭৫

পৃষ্ঠা

১৪.সুচরিতাসু - বিদ্যুৎ ভৌমিক - ৭৫
১৫.চাই বা না চাই - নীলমাধব প্রামাণিক - ৭৫
১৬.কথা কিছু - তীর্থঙ্কর সুমিত - ৭৪
১৭.এ যেন রিকথগ্রাহী - সেখ মহাম্মদ ইউনুস -৭৬
১৮.একান্ত স্বজন - জ্যোৎস্না হালদার - ৭৮
১৯.হাওয়ায় ওড়ে চুল - সুব্রত চৌধুরী- ৭৭
২০. জোৎস্না তোমাকে - শেখ সিরাজ - ৭৭
২১.বন্ধু তুমি আমার - রবিয়াল চৌধুরী - ৭৭
২২.সেথায় যেতে চাই - প্রহ্লাদ কুমার প্রভাস - ৮০
২৩.ভ্যাবলা ফোড়ন - জলি ঘোষ - ৭৮
২৪.আমার দুর্গা আজ অসহায় - বটু কৃষ্ণ হালদার - ৭৯
২৫.বাঁচো - অ্যামেলিয়া দাস - ৭৯
২৬.শামুকের অনাগত শোক - সাহানুর হক - ৭৯
২৭.ছবি - জুমেলী সরকার - ৮০
২৮.ভাবনা - শম্পা ঘোষ - ৮০
২৯.আমার দেখা - গৌ উ র দে- ৮৬
৩০.ভাঙাচোরা গল্প - হাসি বসু - ৭৯
৩১.বিদায় রসিদ ভাই - বিশ্বজিৎ সিনহা - ৮১
৩২.সিগনেচার - অন্তরা সরকার - ৮১
৩৩.বসন্ত - মন্দিরা মুখার্জ্জী ব্যানার্জ্জী- ৮১
৩৪.বীভৎস বালির জিহ্বা - শংকর নাইয়া - ৮২
৩৫.এই শরতে - কাশীনাথ মোদক - ৮১
৩৬.জীবিত সময় - সুভাষিতা ঘোষ (দাস)- ৮২
৩৭.প্রেমের উপাখ্যান - তরুন কুন্ডু- ৮৪
৩৮.অপেক্ষার আলো - পলাশ পাল - ৮২
৩৯.ঝড়ের দাপট - দীপঙ্কর বৈদ্য - ৮৩
৪০.জ্যোৎস্না মাখা কবি -সুবিমল সোম- ৮৩

পৃষ্ঠা

৪১.গ্রীষ্মের দুপুর - সৌমেন কর্মকার - ৮৩
৪২.এখনও তোমারই - মানালি - ৮৩
৪৩.শরৎ এল রে - রমা মুখার্জি - ৮৪
৪৪.অধরা নক্ষত্র - ড.শমিতা ভট্টাচার্য - ৮৫
৪৫.শেষ আশ্রয় - অভিজিৎ রানা - ৮৪
৪৬.কাক - ইরফান মল্লিক - ৮৬
৪৭.জীবন স্রোতের টানে - সমীর কুমার দত্ত - ৮৫
৪৮.অ-এ অজগর - দিলীপ কুমার মধু - ৮৬
৪৯.চিত্র নাট্যের শিল্পী মাত্র - অখিল চন্দ্র পাল -৮৫
৫০.মেহনতি কণ্ঠস্বর - সৌরভ আষ- ৮৭
৫১.জীবন যাযাবর - শম্পা কর্মকার - ৮৬
৫২.মায়াটান বড় - জয়শ্রী সরকার - ৮৯
৫৩.ঝড় বৃষ্টিতে নাকাল - সুলেখা চৌধুরী (মল্লিকা)- ৮৭
৫৪.প্রতীক্ষা - কার্তিক পাত্র - ৮৮
৫৫.ঐসব শৈশব - সিদ্ধেশ্বর দত্ত - ৮৮
৫৬.সমান্তরাল - মোনালিসা সাহা দে - ৮৮
৫৭.আমার শহর কাঁদে মধ্যরাতে - বিপাশা সমাদ্দার -৮৯
৫৮.খোঁকার রেস্টুরেন্ট - গোবিন্দ মোদক - ৯০
৫৯.রাক্ষুসে রিল - তন্ময় অধিকারী - ৯০
৬০.রাতের জন্য - সৈয়দ আতাউর রহমান - ৮৯
৬১.আগুন ও বৃষ্টি - সুপ্রভাত মেট্যা- ৯০
৬২.আত্মরতি - গৌতম ঘোষ- দস্তিদার - ৯২
৬৩.সময় অসময় - আনন্দ গোপাল গরাই - ৯০
৬৪.একাকীত্ব - মলয় সরকার - ৯১
৬৫.আরোহণ সংক্রান্ত - গৌতম কুমার গুপ্ত ৯১
৬৬.কতখানি আগুন লাগলে - চিরঞ্জিত ভান্ডারী -৯১
৬৭.ঝড় বাদলে ছিন্ন দু'জন - অভিজিৎ পাত্র-৯২

খবর সোজাসুজি

খবর সোজাসুজি

চোখে চোখ রেখে কথা বলে !!!

লেখক পরিচিতি

১. সুনীতি মুখোপাধ্যায় - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের ইলামপুর গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম- ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৭। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক,বেতার-নাটক এবং সঙ্গীতালেখ্য রচনায় সর্বভারতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সহ বহু পত্রিকা-পুরস্কারে সম্মানিত, আকাশবাণী কলকাতা, জামসেদপুর এবং আগরতলা কেন্দ্রের স্বীকৃত গীতিকার এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। যুক্তাক্ষর বিহীন নবসাক্ষরদের জন্য লিখিত 'আজকের কবিতা' পুস্তকের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

২.বিজন গঙ্গোপাধ্যায় -বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ,পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রামের আঁটপাড়ার বাসিন্দা।

৩.বিজন দাস - জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার মহিষগড়িয়া গ্রামে। মূলত ছড়া লেখক।এযাবৎ তিনখানা বই প্রকাশ পেয়েছে। হেই ছড়া তোর পায়ে পড়ি,প্যারাম পাম ছড়ার খাম,আর তা চু কিত কিত।

৪.সুব্রত মিত্র রানা - জন্ম ১৯৭২। পিতৃভূমি বর্ধমান শহর, কৈশোর থেকে মাতৃভূমি গুড়াপ, হুগলির বাসিন্দা। আত্মপ্রকাশ 'শুকতারা'য়। লিখেছেন 'সন্দেশ', যুগান্তর, 'চাঁদের হাট, কিশোর বাংলা প্রভৃতিতে।কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস', 'তাঁতঘর', 'কাহ্ন' 'কৃতি এখন'র মত বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে।প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'উপগ্রহের ডাক বাক্সে'।

৫.পার্থ পাল - হুগলি জেলার গুড়াপ থানার মৌবেশিয়ার বাসিন্দা।পেশা শিক্ষকতা।নেশা সংস্কৃতিচর্চা।বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্রে চলে নিরন্তর লেখালেখি। বক্তব্য রাখতে ভালবাসেন।

৬.অরুণকুমার মান্না - ৪ ঠা মার্চ ১৯৭১, হুগলির তারকেশ্বর থানার বিনগ্রামে। খুব ছোট থেকেই সাহিত্য সেবায় মগ্ন।

৭.সুফি রফিক উল ইসলাম- কবি,গল্পকার, ক্রীড়া নিবন্ধকার,ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাংবাদিক।নেশা কবি সম্মেলন, সাহিত্যসভা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুযোগ পেলে ছুটে যাওয়া। নিবাস পূর্ব বর্ধমানের মেমারির সুলতানপুরের পৈতৃক সঞ্চয়িতা ভবন।

৮.প্রভাস পাল- হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের মৌবেশিয়া গ্রামের বাসিন্দা।গুড়বাড়ি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান। এলাকায় পরিচিত যাত্রাশিল্পী। বেতার যাত্রাপালাকার। এ পর্যন্ত বেতারে সম্প্রচারিত যাত্রাপালার সংখ্যা আঠারো। বেতার নাটক ' পরাজয় ' প্রশংসিত ও পুরস্কৃত।

৯.রমাকান্ত পাঁজা - পূর্ব বর্ধমান জেলার নবস্থা গ্রামের বাসিন্দা।ইতিমধ্যে কুড়িটি যৌথ কাব্য সংকলন ও একটি একক কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।কলকাতায় প্রকাশিত মন কলম সাহিত্য পত্রিকার সহসম্পাদক। বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ ও গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য।

১০.প্রদীপকুমার সামন্ত - জন্ম- ১০ অক্টোবর ১৯৬৫,কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকার । সম্পাদিত পত্রিকা - দীপশিখা। নিজস্ব গ্রন্থাবলী - ১০ টি - সমাজের প্রতিচ্ছবি, কামনার আগুন, ভালোবাসার অঙ্গীকার, ছন্দ নাচে ছড়ার কাছে ইত্যাদি।

১১.ডাঃ সেখ সাবের আলি - জন্ম ৭ ফেব্রুয়ারি,১৯৬১, পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার শ্যামসুন্দরে। কবিতা, গান, গল্প ও ছড়া লেখক।

১২. ডঃ শমিতা ভট্টাচার্য - প্রাক্তন অধ্যক্ষ,এমজিএডি কলেজ, শিলচর ,আসাম।প্রকাশিত বই - ১টি , গল্প , কবিতা , প্রবন্ধ নিয়মিত আসাম , ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৩.অখিল চন্দ্র পাল - জন্ম ১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে আসামের করিমগঞ্জে। পেশা ব্যবসা। নেশা কবিতা লেখা। দেশ বিদেশের প্রচুর পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হয়েছে।এখন পর্যন্ত দুটা কবিতা গ্রন্থ বের হয়েছে।

১৪.সৌরভ আষ -হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম মাতুলালয় বদনগঞ্জে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ করেছেন।লেখা ও গানের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক।

১৫.পার্থ সারথি মহাপাত্র - পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর স্টেশন পাড়ার বাসিন্দা। মূলত কবিতা ও গল্প নিয়ে ব্যস্ত। দুটি কবিতার বই 'হামি বড় মুকরুর ছা' ও 'ক্ষুধার স্পর্শে বর্ণমালা কেঁপে যায়' প্রকাশিত হয়েছে। তিরিশ বছর ধরে নানান পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১৬.বিশ্বজিৎ সিনহা - বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার। হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা।

১৭.মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় - গল্প, প্রবন্ধ, পত্র,ছড়া, কবিতা লেখেন।হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে বসবাস।

১৮.অভিজিৎ পাত্র- জন্ম ১৯৯২ সালের ১৮ মে। হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত মামুদপুর (উঃ) গ্রামের বাসিন্দা। লেখালেখি ছোট থেকেই।

১৯.সুবিমল সোম- জন্ম-১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার পহলামপুর গ্রামে। বাংলায় এম. এ. । পেশা গৃহ শিক্ষকতা। লেখালেখি শুরু ছাত্রাবস্থা থেকেই।

২০.রাসমণি ব্যানার্জী - হুগলির হরিপালের বাসিন্দ। ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখির শখ। পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

২১.অভিজিৎ রানা -জন্ম - ১২ জুলাই,১৯৮৪, হুগলি জেলার গুড়াপের পলাশী গ্রামে।পেশা ও নেশা-শিক্ষকতা,লেখালেখি ও পরিবারকে সময় দেওয়া। প্রিয়,আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ মুহুর্ত - শিশু,নেতাজী ও একান্তে রবীন্দ্রসংগীত শোনার মুহুর্ত । লক্ষ্য - লেখার মধ্যে দিয়ে চেতনা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

২২.দীপঙ্কর বৈদ্য - বারুইপুর চম্পাহাটির অধিবাসী। বাংলা সাহিত্যে এম.এ। সমসাময়িক নানান পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

২৩.তরুন কুন্ডু - জন্ম - ১৯৬০ সালের ৪ঠা মার্চ হুগলি জেলার ধনিয়াখালী ব্লকের সোমসপুর গ্রামে। ১৯৭৭সালে স্থানীয় কলেজে প্রবেশের সাথে সাথে পুরো দমে লেখালেখির শুরু।

২৪.বিদ্যুৎ ভৌমিক-হুগলির তারকেশ্বরের চাঁদুরের বাসিন্দা। ৭০ দশকে কবি বিদ্যুৎ ভৌমিক 'মহুয়া' ও পরে 'মহুয়া মন 'সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিবিষ্ট ছিলেন । সেই সময় দুটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া ও কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছন। বর্তমানে সাংবাদিকতা করেন।

২৫.শম্পা ঘোষ - বাসস্থান তারকেশ্বর, হুগলি।পেশায় মনস্তত্ত্ববিদ,সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। অনেক ছোটবেলা থেকে লেখালেখির শখ। ইতিমধ্যে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ব্ল্যাক হোল ও কিউবিক টার্ন।

২৬.গোপালী গঙ্গোপাধ্যায়(নন্দী) - জন্ম ১৭ই শ্রাবণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার মাধবপুর গ্রামে।শিশুদের ছড়া ও কবিতা এবং বড়দের প্রতিবাদী লেখায় কবির বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়।

২৭.মহম্মদ ইউনুস- জন্ম- বাংলা ২রা ফাধন মঙ্গলবার ১৩৫৬ সন।বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা ছাপা হয়েছে। বর্তমানে মেমারি পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড (খাঁড়ো)-এ স্থায়ীভাবে বসবাস।

২৮.জ্যোৎস্না হালদার -হুগলির হরিপালের বাসিন্দা। শখ-বই পড়া, লেখালেখি করা।

২৯.ইরফান মল্লিক - জন্ম - ২ জানুয়ারি,২০১৫ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মথুরাপুর গ্রামে।কবিতা ও গল্প লিখতে ভালবাসেন।আঁকতেও ভালবাসেন।বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত।

৩০.স্নেহা মল্লিক - জন্ম - ২০ আগষ্ট,২০০৮ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মথুরাপুর গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসেন।বর্তমানে দশম শ্রেণীতে পাঠরত।

৩১.সিদ্ধেশ্বর দত্ত - হুগলি জেলার গুড়াপ থানার খানপুরের বাসিন্দা।পেশায় - শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।

৩২.মন্দিরা ব্যানার্জ্জী মুখার্জ্জী - পিতা গোপাল ব্যানার্জি ও দাদু কেশব চন্দ্র নাগের অনুপ্রেরণায় সাহিত্য জগতে আগমন।সমাজসেবী, ক্রীড়া,সংগীত,নৃত্য ও নাট্য জগতের মানুষ। প্রকাশিত বই 'স্মৃতির তরী'। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপের বাসিন্দা।

৩৩.ড.সুপ্তি সরদার -পেশা - অধ্যাপনা, নেশা - সাহিত্য চর্চা। লেখিকা ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করেন বিভিন্ন পত্র পটিকায়। কলকাতা বইমেলা ২০২৪ এ ওনার একটি গল্প সংকলনের বই 'অবতারনামা' এবং দুটি কবিতার বই - 'বিন্দু বিন্দু প্রেমসিন্ধু' এবং 'বর্ণমালায় বেঁধেছি মন' প্রকাশ পেয়েছে। বাড়ি - কলকাতা।

৩৪.রবিয়াল চৌধুরী - বাঁকুড়ার জয়পুর থানার আঙ্গারিয়া গ্রামের বাসিন্দা।লেখক আর্থিক জটিলতাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তিনি পেশায় শিক্ষক। ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখি পছন্দ করেন। তাঁর লেখা প্রথম কাব্য গ্রন্থ ''দিগন্তের গোধূলি '' ।তিনি ছন্দ মালা সাহিত্য পত্রিকা নামে একটি অনলাইন পত্রিকা পরিচালনা করেন।

৩৫.লাজবী মুখার্জী - নিবাস - কলকাতার, পাইকপাড়া।অণুজীববিদ্যা বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হলেও ছোট বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি এক অদ্ভুত টান আর সেই ভালোবাসার টানে সাহিত্য জগতে প্রবেশ।

৩৬.রবীন বসু - জন্ম ১৯৫৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। প্রকাশিত কবিতার বই ১২,গল্পগ্রন্থ ৩, উপন্যাস ১, কাব্যোপন্যাস ১ ।কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩ ও অন্নদাশঙ্কর রায় স্মৃতি সম্মাননা ২০২৩ প্রাপক।

৩৭.মানিক চন্দ্র সৌ - পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও বিএড উত্তীর্ণ । পেশায় শিল্প শ্রমিক ।মনের মানুষ ও মনের মানুষ দ্বিতীয় খন্ড নামে দুটি উপন্যাসের রচয়িতা ।

৩৮.বাবলু কাজি - নিবাস - বিদ্যাসাগর পল্লি,রামপুরহাট, বীরভূম। ১৯৯৩ সাল থেকে লেখালেখি শুরু।শুকতারা,কিশোর ভারতী মৌচাক, অণুপত্রী,অণুরণন সহ বেশ কিছু পত্রিকায় ছড়া,কিশোর কবিতা ও অণুগল্প লিখে চলেছেন। ওনার মা কাজী নজরুল ইসলামের নাতনি।

৩৯.তন্ময় কবিরাজ - বাড়ি - দলাই বাজার, রসুলপুর, পূর্ব বর্ধমান। ইংরাজিতে স্নাতক।পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি পাস করে বর্ধমান জেলা আদালতে প্র্যাকটিসরত।লেখালেখিতে প্রচন্ড আগ্রহ।বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন।

৪০.মনোরঞ্জন ঘোষাল - বাড়ি - আত্মারামপুর,পশ্চিম রামেশ্বরপুর,বজ বজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সাহিত্য সব রকম লেখাই লেখেন।গল্প কবিতা কল্পবিজ্ঞান রহসঞ্চ প্রেম শিশুতোষ লেখা বহু পত্র পত্রিকায় লিখে চলেছেন।জন্ম ২ জানুয়ারি ,১৯৭২, প্রকাশিত বই বিজ্ঞানী বিনি, ডিটেকটিভ দুজো, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, আলোর পথে।

৪১.তীর্থঙ্কর সুমিত - বাড়ি -মানকুণ্ডু,হুগলি। বর্তমানে বিশ্ববাংলা সাহিত্য পরিষদ সংগঠনের সভাপতি।নিজ সম্পাদিত পত্রিকা একালের ছিন্নপত্র ও আহোরী।

৪২.সুজন দাশ - জন্ম - বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বোয়ালখালী উপজেলার উত্তরভূর্ষি গ্রামে ১৯৭০ সালের একুশে এপ্রিল। লেখালেখি-বাংলাদেশ ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী পত্রিকায় লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ চারটি। বর্তমানে আমেরিকার নিউ জার্সিতে বসবাস করেন।

৪৩.নাজমুল কবির - বাড়ি বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে। নিভৃতচারি কবি নাজমুল কবির মসির আঁচড়ে সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করে পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছেন। ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ সালে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানার বড়াইগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি পছন্দ করতেন।

৪৪.প্রহ্লাদ কুমার প্রভাস - জন্ম ৩ ফেব্রুয়ারি,২০০৩ বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বল্লভপুর গ্রামে। সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স অর্নাস প্রথম বর্ষের ছাত্র।

৪৫.তুষার ভট্টাচার্য - বহরমপুরে থাকেন। দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন।দেশ, সানন্দা, কৃত্তিবাস সহ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ।প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ৪টি।

৪৬. সুচরিতা চক্রবর্তী - জন্ম ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই।শিক্ষা - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।সাহিত্যচর্চা শুরু স্কুল কলেজ জীবনে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পাঁচটি।

৪৭.সাহানুর হক - কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরের বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।

৪৮.কল্যাণ সেনগুপ্ত - জন্ম ১৯৫২। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৪। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত।

৪৯.সন্দীপ যাযাবর দত্ত - জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা।পেশা শিক্ষকতা, নেশা লেখালিখি। কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একাধিক কবিতা, গল্প ও অণুগল্প।

৫০.অন্তরা সরকার - জন্মসূত্রে কলকাতার হলেও বর্তমানে দুর্গাপুরের বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। কবিতা, গল্প ,প্রবন্ধ নিয়ে পাঠকের সাথে পথচলা। নিজস্ব তিনটি কাব্যগ্রন্থ ও দুটি গল্পের বই এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত।

৫১.সৈয়দ আতাউর রহমান - বাড়ি - বড়পলাশন, পূর্ব বর্ধমান। কবিতা গল্প ,প্রবন্ধ লিখতে ভালো বাসেন। শখ, পুরানো বই সংগ্রহ,পুরাতত্ব বিযয় জানতে।

৫২.তন্ময় অধিকারী - জন্ম ৯ মে ১৯৯০, বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার এক প্রত্যন্ত গ্রাম কোমরপুরে। বিঞ্জান বিভাগে স্নাতক, বর্তমানে সেলস্ ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। নেশা লেখালেখি।

৫৩.পার্থ প্রতিম গোস্বামী - নিবাস - চন্দ্রকোণা টাউন,পশ্চিম মেদিনীপুর। পেশায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার শিক্ষক। আর নেশায় কবিতা,গান আর প্রকৃতি।

৫৪.রঞ্জন কুমার ব্যানার্জী - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মহিষগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। পেশা-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গ্রুপ 'এ' আধিকারিক। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর।পড়তে ভালো লাগে উপন্যাস আর ছোট গল্প। প্রিয় লেখক-বুদ্ধদেব গুহ। প্রিয় গল্প-সৈয়দ মুজতবা আলীর ক্ষ্নোনাজলক্ষ্ম। হবি-বাগান তৈরি; নিজের বাড়িতে ষোলো রকমের ফলের বাগান নিয়েই অবসরযাপন পরিবারের সাথে। মঞ্চে থাকতে বিশেষ করে যাত্রা-নাটকে অভিনয় খুব আকর্ষণ করে।

৫৫.তপন তরফদার - স্বেচ্ছাবসর প্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। দশটি গল্প গ্রন্থ ও পনেরটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ৫০০ টি পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন ও কলকাতার মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন।বতর্মান নিবাস প্রেমবাজার, খড়্গপুর।

৫৬.কাশীনাথ মোদক - গ্রাম - মনিরামবাটি, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান। স্বাধীন ভারতে ১৫ আগষ্ট কলকাতায় জন্ম। সাহিত্য

সংস্কৃতি ভালোবাসেন। মনিরামবাটি থেকে অন্নদা নামক একটি সাহিত্য পত্রিকার দীর্ঘ বছর সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন।ছড়া, কবিতা লিখতে ভালো বাসেন।

৫৭.শেখ সিরাজ -হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকে যদুপুর (আলা) গ্রামে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজের বাসস্থান। ১৯৮৫ সালে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়।বর্তমানে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা,গল্প,ছড়া লেখালেখি করে থাকেন।

৫৮.শম্পা কর্মকার - বাড়ি হুগলি জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত সাওড়ায়। পেশায় একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। নেশা সাহিত্য চর্চা।

৫৯.মোনালিসা সাহা দে - বহরমপুরের বাসিন্দা, সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে গৃহবধূ ও সাহিত্য চর্চারত। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। স্বরচিত গল্পগ্রন্থ 'নাগরিক প্রেতাত্মারা' বহরমপুরে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০২০ সালে।

৬০.ঋতম পাল - বর্তমানে স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শখ লেখালেখি করা। এছাড়াও গল্প, কবিতা পড়তে ও লিখতে ভালোবাসেন।

৬১.সুলেখা দাস - হুগলির হরিপালের বাসিন্দা।শখ সঙ্গীত আঁকা, সাহিত্যচর্চা।নেশা বাগান করা, ছবি তোলা। পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

৬২.সুবত চৌধুরী - জন্ম-ফেব্রুয়ারি ১০,১৯৬৪,জন্মশহর- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। বর্তমান অবস্থান আটলান্টিক সিটি, নিউজারসি,যুক্তরাষ্ট্র। শিক্ষাগত যোগ্যতা - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্হাপনা বিষয়ে স্নাতকোওর।পেশা- আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত। নেশা- লেখালেখি , সাংবাদিকতা।প্রকাশনা - ছড়ার বই- বিশ্ব বেহায়া।রূপকথা- আতুবুতু কাতুকুতু।

৬৩.রথীন্দ্রনাথ রায় - বাড়ি - গীধগ্রাম,পূর্ব বর্ধমান।১৯৯০ এ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ সাংবাদিকতা।সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোট গল্প এবং উপন্যাসই বেশ ভালো লাগে।

৬৪.রমা মুখার্জী - বাড়ি হুগলির তারকেশ্বরের রামনগর।কবিতা লিখতে ও পড়তে ভালোবাসেন।

৬৫. ছন্দা দাম - আসামের করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।পেশায় শিক্ষিকা। কবিতা লিখতে ভালবাসেন ।এছাড়া গল্প লেখা ও ছবি আঁকা ভীষন প্রিয়।

নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ও পারিপার্শ্বিক সবকিছু ওনার লেখার মূল উপজীব্য।

৬৬.সমীর কুমার দত্ত - প্রাক্তন নাট্য পরিচালক।বাড়ি - বালি, হাওড়া।

৬৭.চিরঞ্জিত ভান্ডারী - জন্ম - ২ জানুয়ারি ,১৯৮১, বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার নিকট শ্যামপুর গ্রামে।ইতিমধ্যে আঘনে ফুল ফোটে,ভেজা কাঠের কান্না, কাচের চুড়ির শব্দে এবং কিছু ঋণ রেখে যায় কাব্যগ্রন্থ পাঠক মহলে সমাদৃত।

৬৮.সুরঞ্জন দেব - কলকাতা নিবাসী, টেরাকোটা, স্থাপত্য এবং ইতিহাস পছন্দের বিষয়।বেড়ানোর মানে হলো নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন।

৬৯.দিলীপ কুমার মধু - পূর্ব বর্ধমান জেলার অধিবাসী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও লিটল ম্যাগাজিনে তার ছড়া নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে হাস্য রসাত্মক ছড়া রচনায় তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

৭০.মায়া সাহা - উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতে জন্ম। বি.এ পাশ। মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং এ সফল হয়ে বিউটিশিয়ান ট্রেনিং কমপ্লিট করে বতর্মানে নিজস্ব বিউটিপার্লারে কাজ করেন।

৭১.মানালি - জন্ম ২০০২ এ, কলকাতায়।বর্তমানে একজন শিক্ষার্থী,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রী। পড়াশোনার ফাঁকেই স্কুলের এক প্রতিযোগিতায় প্রথম গল্প লেখা।তারপর থেকেই কলম থামেনি।

৭২.জয়শ্রী সরকার - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে সাম্মানিক, স্নাতকোত্তর এবং বিএড। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - তিনটি। মঞ্চ সফল রূপক সাংকেতিক নাটক - একটি। লেখালিখি ছাড়াও নেশা - আবৃত্তি-গান।

৭৩.কার্তিক পাত্র - বাড়ি - হাওড়া জেলার কৈজুড়ীতে। নেশা- লেখা,পেশা- মালী, মাঝে মধ্যে রং,তুলিও ধরেন।

৭৪.গৌতম কুমার গুপ্ত - পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বাসিন্দা। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখালেখি শুরু।এ পর্যন্ত তাঁর ৬টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

৭৫.গোবিন্দ মোদক-জন্মঙ্খ ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৭ নদীয়ার রাধানগরে।পেশা-প্রথম জীবনে অধ্যাপনা,পরবর্তীতে ডাক বিভাগেকর্মরত। নেশা - লেখালিখি।

৭৬.মাখনলাল প্রধান - কলকাতার বাসিন্দা,১৯৫৯ সালে পূর্ব মেদিনিপুর জেলায় জন্ম। স্কুল জীবনের শেষের দিকে দু একটা লেখা শুরু হয়।১৯৯৮/৯৯ সালে বড়দের গল্পের বই ' পাখিদের কথা' এবং ছোটোদের গল্পের বই 'স্ট্যাচুভূত ' প্রকাশিত হয়।

৭৭.সুভাষিতা ঘোষ (দাস) - জন্ম বীরভূম জেলায়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''অন্বেষণে ''-আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৩। প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসিকা ক্ষুঅল্প একটু আকাশক্ষু- আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৪।

৭৮.গৌতম ঘোষ-দস্তিদার - কলকাতার বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

৭৯.অ্যামেলিয়া দাস - বাংলা সাহিত্যের একজন নবাগতা সাহিত্যিক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মার্চ কলকাতা শহরে। বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে অধ্যয়নরত।

৮০.নীলমাধব প্রামাণিক - জন্ম ১৯৮৩সালের ১৫ জানুয়ারি। আত্মপ্রকাশ ১৯৯৭সালে । পশ্চিমবঙ্গ,বাংলাদেশ সহ আরও বেশ কিছু দেশের প্রায় দুই শতাধিক ছোট বড় পত্র পত্রিকাও সংকলনে ছড়া কবিতা গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা।

৮১.ড.বিজুরিকা চক্রবর্তী - কলকাতার বাসিন্দা,বর্তমানে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের এমআরইউ ডিপার্টমেন্টে রিসার্চ-সাইন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত। সেন্ট জেভিয়ার'স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তরের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি।কবিতা লিখতে ভালোবাসেন।

৮২.মলয় সরকার - অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক, স্নাতকোত্তর রসায়ন,লেখালিখি বহুদিন। কবিতা, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, অনুবাদ ইত্যাদিতে স্বচ্ছন্দ।

৮৩.শংকর নাইয়া - জন্ম - ২৪ শে জানুয়ারি ১৯৯৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নালুয়া গ্রামে।
পেশা- বেসরকারী কর্মচারী ও সমাজকর্মী

৮৪.আনন্দ গোপাল গরাই - অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন বীরভূম জেলার প্রসাদপুরে। অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টি। এর মধ্যে কাব্যগ্রন্থ, গল্পসংকলন ও নাটক নাটিকা আছে।

৮৫.সুপ্রভাত মেট্যা জন্ম ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পূর্বমেদিনীপুরে। বিজ্ঞানে স্নাতক,চাকুরিজীবী। কিছু বাণিজ্যিক ও অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত। কাব্যগ্রন্থ ১১টি।

৮৬.পলাশ পাল - ১৯৯২ সালের ১০ জুন হুগলি জেলার মানকুন্ডু পালপাড়ায় জন্ম। ছোটবেলা থেকেই লেখালিখি করতে ভালোবাসেন। মূলতঃ কবিতা ও ছড়া লেখেন। ওনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''নিঃশ্বাসের অপেক্ষায়'', দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ''মাটির পাহাড়''।

৮৭. শংকর ব্রহ্ম - ২ রা মার্চ, ১৯৫১ সালে কলকাতায় জন্ম।প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর, ২০১১ সালে। ১৯৭০ সাল থেকে ।

৮৮. জিনিয়া কর - ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।জন্ম ও স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনাও এখানেই। সাতচল্লিশ বসন্ত পেরিয়ে আদ্যপান্ত গৃহবধূ।

৮৯.বিপাশা সমাদ্দার - দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা।কমলা গার্লস ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে পড়াশোনার পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন । বর্তমানে লেখালেখির সাথে যুক্ত।কবিতা লিখতে বেশি ভালোবাসেন।

৯০.বটু কৃষ্ণ হালদার -সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাঠান খালির কামার পাড়া গ্রামে জন্ম।ছোটবেলা থেকে লেখালেখির শখ।

৯১.আহমদ রাজু - কবি ও কথাশিল্পী। বাড়ি-যশোর, বাংলাদেশ।প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা - ৫টি।

৯২.সুজয় সাহা -জন্ম হুগলি জেলার রিষড়ায়।পিতা শম্ভুনাথ সাহা এবং মাতা পিঙ্কি সাহা।শিক্ষাপাঠ-প্রথমে প্রফুল্ল চাকী পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এবং পরে শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

৯৩.শাশ্বত বোস - জন্ম ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর শহরে। তার বিভিন্ন লেখালিখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা তড়রাইয়া মরেদ, তরূপান্তরের পথেদ, তপ্রবাসের বিভীষিকাদ, 'বইমেলা ও একটি গোলাপ', 'পুরোনো মর্গটার কাছে', এবং 'পিশাচসিদ্ধ' ।

৯৪.অবিনাশ ব্যানার্জী - আসানসোলের বাসিন্দা।বর্তমানে একাদশ শ্রেনীতে পাঠরত।

৯৫.জলি ঘোষ - হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা। আশৈশব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগে সাহিত্যচর্চা। স্বরচিত একক কাব্যগ্রন্থগুলি হলো সৃস্টি সুখের উল্লাসে,কল্পনার সাত রঙে,কাব্য লহরী,ছন্দে ছন্দে রচি আনন্দে।

৯৬. গৌ উ র দে - জন্ম ১৯৯৫ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের লালমাটির জেলা বাঁকুড়া-র অন্তর্ভুক্ত হিড়বাঁধ থানার অধীন আসবেড়িয়া নামক ছোট্ট একটি গ্রামে। বাংলা সাহিত্য জগতে ইনি একজন কবিতানুরাগী প্রতিবন্ধী কবি।

৯৭.জুমেলী সরকার- শিলিগুড়ি শহরের মেয়ে এখন মালদার বাসিন্দা। ভারতীয় রেলে কর্মরত। কবি ও বাচিক শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।
৯৮.প্রশান্ত গিরি - পশ্চিম মেদিনীপুরের সাউটিয়া গ্রামে জন্ম।রসায়নে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে কলকাতায় একটি মেডিসিনাল রিসার্চ অর্গানিজশনে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত।
৯৯.সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় - জন্ম ১৯৬০ সালে পুরুলিয়া জেলায়,বর্তমানে আসানসোল শহরের বাসিন্দা।লেখালেখি ছোটবেলা থেকেই এক শিক্ষকের অনুপ্রেরণায়। চার দশক ধরে বহু পত্রপত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ চারটি।
১০০.মিলি ঘোষ - মূলত বিজ্ঞানের ছাত্রী।বছর আড়াই হলো নিয়মিত লেখালেখি চলছে। কিছু পুজো সংখ্যায় লেখা বেরিয়েছে- গল্প, প্রবন্ধ, মুক্তগদ্য।
১০১.চন্দ্রানী মজুমদার - উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মছলন্দপুরের উত্তর চাতরা'র বাসিন্দা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে যথাক্রমে সমাজতত্ত্বে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। বর্তমানে রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব পরিদর্শক পদে কর্মরত। লেখিকার প্রকাশিত একক গ্রন্থ গুলি যথাক্রমে -'রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক', 'শ্যাওলা জমেছে বুকে', 'রহস্য যেখানে গভীর', 'বৃষ্টি ভেজা চোখে', 'দহন জ্বালা' এবং 'স্রোতের বিপরীতে'।
১০২.সমাদৃত দাস - জন্ম মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে।ছোট্ট থেকেই বই পড়ার উদ্দীপনা মনে জাগে। বই পড়তে পড়তেই লেখালেখির সূত্রপাত। বর্তমানে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।
১০৩.তপন কোলে - পাঁচলা, হাওড়ার বাসিন্দা।দীর্ঘ বত্রিশ বছর 'অকৈতব' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। মূলত কবিতাই লেখেন।
১০৪.সৌমেন কর্মকার - বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে।বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে কলেজে পাঠরত।
সপ্তম শ্রেণী থেকে সাহিত্য চর্চায় আগমন।পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখি,গান শোনা ভীষণ পছন্দের।
১০৫.হাসি বসু - কলকাতার বাসিন্দা। গল্প ও কবিতা লিখতে ভালোবাসেন।
১০৬.সজল চক্রবর্তী - জন্ম -১০ অক্টোবর,১৯৫৩, ঢাকুরিয়া,কোলকাতায়। ১৯৭০-এ উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ১৯৭৬-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ১৯৭২-এপ্রিল মাসে 'কালিয়' পত্রিকা'য় প্রথম কবিতা প্রকাশ।
১০৭.মিঠুন মুখার্জী - উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোবর ডাঙায় জন্ম। বাংলা অনার্স ও এম.এ(প্রথম শ্রেণীতে) পাশ করার পর সাহিত্যচর্চা শুরু। 'নারীশক্তি' নামে একটি সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্প 'ব্রাত্য জীবন', 'কন্যাসুখ' ও কবিতা 'নষ্টনীড়', 'মহান জীবন' ইত্যাদি।
১০৮. প্রকাশমান বসু - ছদ্মনামে প্রকাশিত।

শারদ শুভেচ্ছা সহ – **Mob. 7699313815/ 9932356263**

মাতৃ মন্দির রাইস মিলস প্রাঃ লিঃ

গুড়াপ, হুগলি

মাতৃ ভূমি রাইস মিলস এলএলপি

মহানাদ, হুগলি

সম্পাদকীয়

আপনাদের শুভেচ্ছা ও আর্শীবাদে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যা।গত বছরের ন্যায় এ বছরও আপনাদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি।কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও অনেকে লেখা পাঠিয়েছেন।আসাম, ঝাড়খণ্ড, বাংলাদেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকেও লেখা এসেছে। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ আমাদের এই উৎসব সংখ্যা।সকলের লেখা বিবেচিত না হলেও সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে লেখা পাঠানোর জন্য।বরেণ্য সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বিজন গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের উৎসব সংখ্যার জন্য লেখা পাঠিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।ছোটগল্প, অনুগল্প,প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, মুক্ত গদ্য, রম্য রচনা এবং ছড়া ও কবিতার সমাহার এই উৎসব সংখ্যা।যদিও আমাদের খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যায় কবিতা ও ছড়ার ভিড় বেশি।কারণ খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যার জন্য কবিতা ও ছড়া আমাদের পত্রিকা দপ্তরে বেশি এসে পৌঁছেছে।আমরা যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি বেশিরভাগ ছড়া ও কবিতাকে স্থান দিতে।নবীন ও প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি উৎসব সংখ্যায় ছোটোদের লেখাও আছে। নবীন ও প্রবীণ মিলিয়ে মোট ১০৮ জন লেখকের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হল খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যা ২০২৪।সাহিত্য ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার অভিমুখে আমাদের পথ চলা।আর সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের উৎসব সংখ্যার প্রকাশ। আমরা কৃতজ্ঞ পত্রিকা পরিবারের সদস্যদের কাছে, পাঠকদের কাছে, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে। আর যে সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের পত্রিকার উৎসব সংখ্যা বের করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কাছেও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি, আগামী দিনেও আপনারা এভাবে আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক, খবর সোজাসুজি

ছোটগল্প

গণেশের হালখাতা

রমাকান্ত পাঁজা

গণেশ লুঙ্গির গিঁটটা খুলে বুটুয়া বের করে খুচরো সমেত দুবার গুনে দেখল তিনশো কুড়ি টাকা। ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়ে গলায় গামছাটা জড়িয়ে ভ্যানের প্যাটলে চাপ দিয়েই মনে মনে ভাবতে লাগল দিনকাল যা পড়েছে পাঁচশো টাকা সারাদিনে রোজগার না করলে চারজনের সংসারের তিন বেলা ভালো করে খাবার জুটবে না। কাল বাজেটে কি কি কাটছাঁট করা যায় এসব ভাবতে ভাবতে দাঁত দিয়ে বিড়িটা চেপে ধরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্যাটেলের জোরে চাপ দিয়ে এগুতে লাগল। মনে মনে ভাবল জীবনটা ভাঙ্গা ভ্যানের মতোই কখনো টায়ার টিউব খারাপ, কখনো ব্রেক সু, কখনো বল বেয়ারিং, কখনো আবার কাঠের চালিটাই বদলাতে হচ্ছে, কোনো রকমে চলছে এই পর্যন্তই।

বাঁক ঘুরেই দেখে কয়কটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির লাইটের আলোয় দেখল রাস্তার ধারে কেউ একজন পরে আছে। পাশেই তার বাইকটাও ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে। রক্ত গড়িয়ে রাস্তা ভিজিয়েছে। সে অবাক হয়ে যায় এত গাড়ি যাচ্ছে, সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ নেমেও দেখছে না ! মানবিকতা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।কোনো রকমে ভ্যানটা পাশে দাঁড় করিয়ে বিড়ির শেষাংশটা ফাটা সোলের নীচে ফেলে একটু চিপে দিয়ে ছুটে গেল। হাতটা ধরে বুঝল এখনও বেঁচে আছে। এক জন গাড়িবালাকে কোনোরকমে দাঁড় করিয়ে তার সাহায্যে কোনো মতে নিজের ভ্যানে তুলল ভাঙাচোরা শরীরটাকে। তারপর ছুটে চলল একটু দূরে একটা ওষুধের দোকানে। সেখানেও কারও সাহায্য না পেয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েই সরাসরি ভ্যান নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করল, নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে। মনে মনে ভাবল মানুষ হয়ে এই কাজটুকু না করলে কিসের মানুষ। পকেটে থেকে একটা ফোন নং পাওয়ায়, সেই ফোনে যোগাযোগ করে বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থাও করল। বাড়ির লোক যখন এলো রাত তখন মাঝ বয়সী। সবাই যখন সুখ নিদ্রায় গণেশ তখন পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলো দিয়ে চলেছে একা। বাড়ির লোককে সব বলে যখন বাড়ি ফিরল তখন আজানের ডাক শোনা গেল। সেদিন রাত্রে আর খাওয়া হলো না।পরদিন আবার পুলিশের জেরা, এক্সিডেন্টাল কেস।বাড়ির লোক পুলিশের কাছে বলেছে মোহিত বাবুর কাছে নাকি সাড়ে তিন লাখ টাকা ছিল ব্যবসার। সেটা পাওয়া যায়নি স্পট থেকে। তাই ওদের সন্দেহ গনেশই নাকি টাকটা সরিয়েছে। থানায় নিয়ে গিয়ে নানান জেরা করে। সেদিনও ওর রোজগার বন্ধ। গনেশ মনে মনে বলে,''শালা এই জন্যই মানুষের উপকার করতে নেই।''

যাক সেই দিন রাতেই মোহিত বাবুর জ্ঞান ফিরে এলো। উনি আস্তে আস্তে সব বললেন। দুজন বাইক আরোহী পিছন থেকে তাকে মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। তারপর টাকার ব্যাগটা বের করে নেয়।কথা বলার মতো অবস্থায় সে তখন ছিল না। বাইকটাকে এমন ভাবে রাস্তায় রেখে দিয়ে যায় মনে হবে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ওরা মনে করে আমি মারা গেছি। একজন এসে দেখে যায় মাথা মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে, তখনই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে যায় ওরা। তারপর অন্ধকারে অনেকেই আসে দেখে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর কোনো একজন ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে ব্যান্ডেজ করায়, এরপর তাঁর আর কিছু মনে নেই। এটা শোনার পর পুলিশ গণেশকে ছাড়ে।

মোহিত বাবু অনেকটা সুস্থ হবার পর গণেশ একদিন দেখতে গেলে মোহিত বাবু তার নাম ঠিকানা নিয়ে রাখে। মোহিত নন্দী একজন নাম করা কাপড়ের ব্যবসায়ী। শহরের বুকে সবাই তাকে এক ডাকে চেনে। অনেক সেবা প্রতিষ্ঠানেও তার অনেক অবদান আছে। কাগজে তার অ্যাকসিডেন্টের খবর বের হয় সঙ্গে গণেশের নামও। তারপর একদিন মোহিত বাবুর ছেলে কিছু টাকা নিয়ে গণেশকে দিতে যায়। গণেশ কিছুতেই নেবে না। মোহিত বাবুর ছেলে বলে,''তুমি আমার বাবার প্রাণ বাঁচিয়েছো,ডাক্তার বাবু বলেছেন আর এক মুহূর্ত দেরি হলে বাবাকে আর বাঁচানো সম্ভব হতো না। এই নাও পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখো, তোমার কাজে লাগবে।'' টাকা হাতে নিয়ে তিন'শ টাকা নেয় বাকি টা ফেরত দেয় গণেশ। বলে, ''এই টাকাটা সেদিন থেকে ওষুধের দোকানে ধার আছে,দিতে পারিনি। আজই দিয়ে দেবো।'' আরো বলে, ''প্রানের কি আর মূল্য হয় গো দাদাবাবু !'' বিস্মিত হয়ে যায় মোহিত বাবুর ছেলে। মোহিত বাবুও সুস্থ হয়ে দিব্যি ব্যবসা

করছেন। করোনার দুবছর সে ভাবে কিছু করতে পারে নি। তাই এবারের হালখাতাটা খুব ধূমধাম করে করবে বলে ঠিক করেছে মোহিত বাবু। অনেক জনকে আমন্ত্রণ জানায়।দোকান ফুল বেলুনে সাজানো, মিষ্টি, বড় ক্যালেন্ডার, নানান ধরনের গিফট। আর নববর্ষের কেনাকাটার উপর লটারি আরো নানা উপহার। ফেস্টুন ব্যানারে ছেয়ে যায় গোটা শহর। প্রচারের আলো ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পুরো শহর জুড়ে সাড়া পড়ে যায়। গনেশ ঐ দিকে ভ্যান নিয়ে যাবার সময় দেখে, দোকানটা কেমন একটু একটু করে সেজে উঠছে।

একদিন পিওন ওর বাড়িতে একটা কার্ড দিয়ে যায়।দেখে মোহিনী বস্ত্রালয়ের নববর্ষের আমন্ত্রণ পত্র। গণেশ অবাক হয়ে যায়। ঐ দোকানে ঢোকার যোগ্যতাই তো তার নেই। পরদিন আবার মোহিত বাবু খুঁজে খুঁজে বাড়ি এসে বলে গেছেন যেতে। যদিও গনেশের সঙ্গে দেখা হয় নি।

তবু গণেশের বউ বলে, ''অতবড় মানুষ আমাদের বাড়ি এসে বলে গেল,তোমার যাওয়া উচিত।''

তুই তো বলে দিচ্ছিস, ঐ দোকানে গেলে কিছু তো কিনতে হবে ! আর ওখানে যারা যায় আসে তাদের জামাকাপড় কেমন জানিস ! এই ছেঁড়া গেঞ্জি আর কোঁচকানো জামা পরে ঐ দোকানে ঢোকা যায় না।

তবুও তোমার যাওয়া উচিত।

তারপর অনেক ভেবে ধার করে একটা কমদামি পাঞ্জাবি আর পায়জামা কেনে। নববর্ষের দিন সন্ধ্যাবেলায় বউ বলে বেশ মানিয়েছে তোমায়। সঙ্গে সঙ্গে গলার বোতামটা একটু লাগিয়ে নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বেড়িয়ে পড়ে। পথে কতজন টিপ্পুনী কাটে পাঞ্জাবি পরা উত্তম কুমার বলে। হাসি মুখে সব সহ্য করে চলে যায়। এতো বড় একটা জায়গায় আমন্ত্রণ পেয়েছে বলে কথা, তারপর আবার মালিক নিজে এসে বলে গেছে। ওরা তো আর এমন আমন্ত্রণ পায় নি তাই হয়তো ঈর্ষার কারণে এসব বলছে। এসব ভাবতে ভাবতে পৌঁছে যায় দোকানে।

দেকানের সামনে বিরাট ভিড়। ফুল বেলুন লাইট অপূর্ব লাগছে দোকানটা। সবাই আসছে চারচাকা নিয়ে কিছু কিনছে খাওয়া দাওয়া করছে, হাসি মসকরা করে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন তো আবার নামি-দামি দুচাকার গাড়ি নিয়ে আসছে। গণেশের মতো এখানে একজনও নেই। দেকানের ভিতরে বাইরে প্রচুর ভিড়। বাইরে দুজন সিকিউরিটি গার্ড আছে। তারা সবাইকে চেক করে ঢোকাচ্ছে বেড় করছে।

এসব দেখে গনেশ দোকানে যেতে ইতস্তত করতে লাগলো। তিন বার মাথাটা চুলকে দাঁত দিয়ে নখটা দুবার খুঁটে, যা হবে তা দেখা যাবে ভেবে দোকানের সামনে গেল।সিকিউরিটি আটকালো, বলল কি চাই? গণেশ ইতস্তত ভাবে বলল ভিতরে... কথা শেষ হতে না হতে ভিতর থেকে একজন বলল, একটু ঠাণ্ডা দিয়ে ছেড়ে দে। পাশে নামানো বোতল থেকে গ্লাসে কোল্ড ড্রিঙ্ক দিল এক জন। বলল যা চলে যা। সেটা আর গণেশের গলা দিয়ে নামল না। মনে মনে ভাবল এ কী রকম আমন্ত্রণ ! বড়লোকেদের আমন্ত্রণ কি এমন হয় ! কী বলবে বাড়ি গিয়ে, যদি একটা মিষ্টিও না নিয়ে যায়। খুব আত্মসম্মানে লাগলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভাবল যদি মোহিত বাবুর দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু না আজ তার অমবস্যা চাঁদের দেখা পেলো না। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখে কয়েকজন একটা কাপড়ের গাঁট বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। গণেশকে বলে বয়ে দেবার জন্য। ত্রিশ টাকা দেয় ওরা। তিনটে দশ টাকার নোট তিন বার গুনে কপালের ঘামটা একটু মুছে নেয়। কপালের ঘাম আর চোখের নোনতা জল তখন এক হয়ে গাল দিয়ে গড়িয়ে পরছে। তার নতুন পাজামা পাঞ্জাবিটাও নোংরা হয়ে যায়। তা যাক, ঐ ত্রিশ টাকা দিয়ে বাড়িতে তো মিষ্টি নিয়ে যাওয়া যাবে। বাড়ি ফিরে বলে ওদের মত নাকি মানুষ হয় না, যেমন মোহিত বাবু তেমনি তার ছেলে, কত আপ্যায়ন করেছে তারা।

বলল বটে কিন্তু মনের যন্ত্রণাটা কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না। বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। দূরে বাঁধানো অশ্বত্থ তলায় গামছা নিয়ে গিয়ে বসে। মনে মনে ভাবে সব বড়লোকই কি একই রকম ! গরীবদের সম্মান দেয় না ! এমন আমন্ত্রণ না করলেই পারত। আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও তো আত্মসম্মান আছে।

এদিকে রাত হয়ে আসছে,দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেল।মোহিত বাবুর চোখ পড়ল সেই প্যাকেটার উপর, যেটা গণেশের জন্য রাখা ছিল। আরে ! ও তো আসে নি ! দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে দেখে সে এসেছিল কি না। কেউ বলতে পারে না। শেষে সিকিউরিটির মুখে বর্ণনা শুনে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মোহিত বাবু।দেখে কেমন করে বিতৃষ্ণায় কোল্ড ড্রিঙ্কস ফেলে দিচ্ছে গনেশ,কেমন করে মোট বয়ে জামা নোংরা করে চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যাচ্ছে। মোহিত বাবু আর দেরি না করে প্যাকেট নিয়ে সোজা গণেশের বাড়ি।গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হনহন করে

হেঁটে যখন গণেশের বাড়িতে পৌঁছাল, গনেশ তখন বাড়িতে নেই। বউয়ের মুখে সব শোনে যে তারা তাকে কত আপ্যায়ন করেছে, ত্রিশ টাকার মিষ্টি কিনে দিয়েছে এইসব। মোহিত বাবুর নরম মনে আঁচড় কেটে যায়। এরপর গণেশকে ডেকে নিয়ে আসে অশ্বত্থ তলা থেকে। মোহিত বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে তোরা অধিকার নিতে জানিস না। অধিকার কেউ দেবে না ওটা ছিনিয়ে নিতে হয়। গেলি অথচ আমার সঙ্গে দেখা না করে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে এলি ! গণেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে মোহিত বাবু বলল, আমি সব জানি তোকে কিচ্ছু বলতে হবে না। তোর জন্য এগুলো রেখে ছিলাম, বৌমার শাড়ি, তোর পাজামা পাঞ্জাবি, ভিতরে বিল আছে দুহাজার তিন'শ পঁচিশ টাকা। সঙ্গে দুটো বড় প্যাকেটে মিষ্টি আর একটা বড় ক্যালেন্ডার।

গনেশ বলে, ''বাবু বিলের টাকা তো আমি দিতে পারব না। ''

দূর বোকা ওটা আমি তোকে কিনে দিয়েছি, আমার টাকা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যাবি বিলটা নিয়ে। ঐ দিন লটারি হবে, বিভিন্ন পুরস্কার আছে। যদি তোর কপালে থাকে তো ... যাবি কিন্তু নিশ্চয়ই...

বলে দ্রুত চলে যায় মোহিত বাবু।

গনেশের দেওয়ালে এতবড় ক্যালেণ্ডার টাঙানোর জায়গা নেই, তাই ক্যালেণ্ডারটা খোলেইনি। এই করতে করতে কেটে গেল কয়কটা দিন। সকালে মুখার্জীবাবুদের বাড়ি থেকে অক্ষয়তৃতীয়ার পূজার প্রসাদ নিয়ে এসেছে বউ। প্রসাদ খেতে খেতে মনে পড়ে যায় মোহিত বাবুর কথা। বিকালে মেঘ মেঘ করেছে তবু ওই দিন বিকালেই সেই ভাঙাচোরা ভ্যানটা নিয়েই চলে যায় পুরানো জামা কাপড় পড়েই।

যাওয়া মাত্রই সবাই ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে। কি সব বলা বলি করছে নিজেদের মধ্যে। স্টেজে লটারি খেলাও শুরু হয়ে গেছে। অনেক রকম পুরস্কার ঘোষণা হচ্ছে গণেশের নাম্বারে একটাও মিলছে না। গণেশ ভাবে বেকার এলাম। দু'একটা ভাড়া পেলেও পেতে পারতাম। আমাদের কাছে পেটটাই সবার আগে। এবার শেষ পুরস্কার হিসাবে প্রথম পুরস্কারের কুপন তুলবেন মোহিত বাবু। এবার গণেশের বিলের নাম্বারের সঙ্গে মিলে গেল ! প্রথম পুরস্কার হিসেবে গণেশ টোটো লাভ করল। সবাই স্টেজের উপর গণেশকে দেখল। মোহিত বাবু গণেশ সম্বন্ধে সব বলার পর স্টেজে টাঙানো বড় ক্যালেন্ডারটা দেখালেন। গণেশ অবাক ক্যালেন্ডারে তার ছবি। নীচেয় লেখা সত্যিকারের সৎ মানুষ এই গণেশ,যা আমার ব্যবসার গণেশের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।তাই এবারের ক্যালেন্ডারে তারই ছবি।

মোহিত বাবুর ছেলে নীচু স্বরে বলল, '' বাবা প্রথম পুরস্কারটা সত্যি কি লটারি হল না অন্য খেলা !''

মোহিত বাবু বললেন, ''শোন সব কিছু ব্যবসার হিসাবে বিচার করতে নেই, প্রথম মানুষ হতে হয়।আর টাকা যদি মানুষের কল্যাণে না লাগে তো সেই টাকার কোনো মূল্য নেই। এই গণেশ প্রথম পুরস্কার না পেলে ব্যবসার গণেশ রাগ করতেন বুঝলি।''

গনেশের টোটো এখন সারা বছর মোহিনী বস্ত্রালয়ে কাজ করে।গণেশের হালখাতাটা বেশ ভালোই কাটল।

উৎসবের পূণ্যলগ্নে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা--

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

▶ অরণ্য সপ্তাহ ▶ কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্প এখন বিশ্বে সমাদৃত ▶ স্বাক্ষরতা ঃ স্বাক্ষরতার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ▶ কমপিউটার প্রশিক্ষণ ঃ কমপিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ▶ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ঃ তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ▶ বিশুদ্ধ পানীয় নলকূপ ঃ নিরাপদ জলপান, করবে সুস্থ জীবন দান ▶ বিপর্যয় মোকাবিলা ঃ পঞ্চায়েত আপনার পাশে ▶ ঢালাই রাস্তা ও মোরাম রাস্তা ঃ গ্রামীণ যোগাযোগের উন্নতি ▶ দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে সফল করা

টুম্পা ধাড়া
উপ প্রধান

ওয়াসিম রেজা
প্রধান

এক আদুরীর কথা

রথীন্দ্রনাথ রায়

ওর নামটা আদুরী হলে কি হবে, মোটেই আদরের ছিলনা সে। পাঁচ বোনের মধ্যে সে ছোট। একটা ভাইয়ের জন্য হা পিত্যেশ করে করে ওর জন্ম। সুতরাং জন্মের পর থেকে অনাদরে অবহেলায় তার বড় হয়ে ওঠা। সে অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার আগেই চোদ্দবছর বয়সেই তার বিয়ে হয়। তারপর বিয়ে ব্যাপারটা বোঝার আগেই এক কন্যা সন্তানের মা হওয়া । মা হওয়ার পরপরই ওর স্বামী হাবল বাউড়ি কেরল গেল রাজমিস্ত্রির কাজ করতে।

ফিরল না হাবল। শাশুড়ির লাথি ঝাঁটা আর প্রায় অনাহারে কোনোরকমে চলে যাচ্ছিল ওর দিনগুলো।

কিন্তু সেবার এক শীতের রাতে মেয়েকে নিয়ে ওর ভাঙা ঘরে শুয়েছিল। হঠাৎ মাঝ রাতে টিনের দরজা ঠেলে কে যেন ওর ঘরে ঢুকল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চেষ্টা করল বলাৎকার করতে। পাশেই ছিল একটা চেলাকাঠ। আগাপাশতলা ঠ্যাঙালো লোকটাকে। শাশুড়ি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে অপবাদ দিল আদুরীকেই। ও নাকি টাকার জন্য --

সে রাতেই ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হল। পরে বুঝেছিল ওটা ছিল শাশুড়ির চক্রান্ত। আর যাকে ঠেঙিয়েছিল সে ওর দেওর। ক'দিন এখানে সেখানে ঘোরাঘুরির পর বর্ধমান স্টেশনে এসে পৌঁছাল। মেয়েটাকেও খেতে দিতে পারলনা ক'দিন। নিজের পেটেও জ্বালা। হাত পাতল লোকেদের কাছে। ক্ষিধেটা মিটল। তারপর একদিন স্টেশনে অনাবশ্যক ঘোরাঘুরির অজুহাতে রেল পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেল। লক আপে আটকে রাখল ওদের। খেতেও দিল। রাতের বেলায় কয়েকজন ওর দেওরের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার শরীরের ওপর। একের পর এক, কতজন যে ওকে ধর্ষণ করল কে জানে ! হুঁস ছিলনা তার। জ্ঞান ফিরলে দেখল সে রেললাইনের পাশে পড়ে আছে। মেয়েটাকেও খুঁজে পেল না। দু চার দিন এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করল। ক্ষিধে মিটলেও মেয়েটার জন্য মনটা হু হু করত। অন্ধকারে কাঁদত। কিন্তু অন্ধকারেও একধরনের ভয় থেকে বাঁচতে রাতের বেলায় এখানে ওখানে মাথা গোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই রেল পুলিশের উৎপাত। আবার অন্য লোকেদের উৎপাতও ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত আর এক ভিখারিনীর পরামর্শে ভিখারী সর্দারের ডেরাতেই গেল।

লোকটা কুষ্ঠ আক্রান্ত। আগে ভিক্ষে করত।এখন আর করে না।এখন সে ভিখারীদের সর্দার।রেলপুলিশ, রাজনৈতিক নেতা এবং স্টেশনের অন্য দাদাদের সঙ্গে তার বেশ খাতির। দৈনিক একশো টাকা করে তাকে দিত হত।হাড় জিরজিরে রোগগ্রস্ত একটা শিশুকে ভাড়া নিত। তার জন্যও ওই শিশুর মাকে দিতে হত একশো টাকা। পুলিশের ডাকবাবুকেও দিতে হত। টাকা নয়।অন্য কিছু চাইত শয়তানটা।তাই রাতের বেলায় বাতিল সিগন্যাল কেবিনে যেতে হত আদুরীকে। পুষিয়ে দিতে হত শরীর দিয়ে। তারপর আরও বেশি রাত হলে টিকিট কাউন্টারের সামনেটা যখন ফাঁকা হয়ে যেত তখন সে একটা ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে পড়ত। আর এক ভিখারীর কাছ থেকে পাওয়া একটা চাদর গায়ে ঢাকা নিত।

ওই ভিখারীটা বেশ ভালো। বয়স হয়েছে তবে কতো সেটা বলতে পারেনা। বেশ কিছুদিন আগে হঠাৎই ওর বাঁ পা সরু হয়ে যেতে থাকে। ডাক্তার বললে পোলিও। নিজে যতদিন পারল ডাক্তার দেখাল, ওষুধ খেল। কিন্তু সারল না। একসময় বাঁ পায়ের ক্ষমতাই চলে গেল। লাঠি ধরে হাঁটতে লাগল। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে -- কেউ তেমনভাবে দেখল না। তারা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কোনও দিন খেতে দিত, আবার কোনও দিন ভুলে যেত। ক্ষিধের জ্বালায় প্রথমে বন্ধুদের কাছে, পরে অন্যদের কাছে হাত পাততে শুরু করল। স্ত্রী বললে, হাতই যদি পাতবে তাহলে এখানে কেন, অন্য কোথাও গিয়ে পাতো। তোমার জন্য আমাদের সম্মান বলে আর কিছু রইল না।

সেই বেরিয়ে এসেছে। কাউকে ওর ঠিকানা বলে না। যদি তাতে ওদের সম্মান নষ্ট হয় ? লোকটা শুধু কাঁদে।

আদুরী একসময় ভাবতো জগতে দুঃখী সে শুধু একাই। এখন বুঝতে পারল, সে একা নয়। অজস্র লোক তার থেকেও বেশি দুঃখী।হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, বাবা তুমি কেঁদোনা। লোকটা চোখের জল মুছে বলল, তুই আমাকে বাবা বললি মা ?

-- হাঁ তো। তুমি তো আমার বাবার মতোই। তাহলি বাবা বলব নাই কেনে ?

লোকটা এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। আদুরীও কাঁদল। হয়তো কিছুটা কষ্ট কমল ওদের।

স্টেশনেই ভিক্ষে করে আদুরী। হাড় জিরজিরে

শিশুটাকে কোলে নিয়ে সব প্লাটফর্মে ঘোরে। ট্রেনেও ওঠে। যাকে সে বাবা বলেছে সে এক জায়গায় বসে থাকে, চলতে পারে না। তাই ভিক্ষেও বেশি পায় না। সর্দারের টাকা দিতে না পারলে, সর্দারও বকাঝকা করে, গাল দেয়। আদুরী সেটা দেখার পর থেকে সে ভিখারী বাবার দায়িত্ব নিয়েছে। রাত্রে ভিখারী বাবা কাছাকাছি থাকার ফলে এখন আর কেউ তাকে তেমন বিরক্ত করে না। একটু স্বস্তিতে ঘুমায় সে। কিন্তু সেদিন বাবা তাকে ডাকাডাকি করল। ঘুমজড়ানো কণ্ঠে আদুরী বললে, কি হইচে গো বাবা ?

-- ওঠ মা। এই দ্যাখ খাবার এনেছি। একটা বিয়েবাড়িতে গেছিলাম। প্যাণ্ডেলের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলুম । যার বিয়ে সে আমায় ধরে নিয়ে গেল। জড়িয়ে ধরলে। মনে হল যেন আমার ছেলে। বৌটিও যেন নক্ষী পিতিমে আমাকে যত্ন করে খাওয়ালে। আমি বললুম, আমার একটা মেয়ে আছে -- তা শুনে ওরা তোর জন্যেও খাবার দেছে।

-- বাবা !

আদুরীর দুচোখে জল। তার কুড়িয়ে পাওয়া বাবা খাবার এনেছে।

আকাশের নিচে সোডিয়াম বালবের আলোয় রচিত হল বাপমেয়ের কঠোর গদ্য।

দশঘরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। নারী শিক্ষার দিশা হল কন্যাশ্রী। এটি একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প, যা আজ সারা বিশ্বে সম্মানিত। ২। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী। ৩। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী। ৪। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক। ৫। আসুনশৌচাগার গড়ি, মনের সুখে ব্যবহার করি। ৬। বিলাব কেন মা বোনের মান, রাখব ধরে ঘরে নারীর সম্মান।

আমাদের অঙ্গীকার–

সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে সততা, নিষ্ঠা, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা দায়বদ্ধ।

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

সাবিনা খাতুন
প্রধান

বন্ধুত্বের শারদোৎসব

ঋতম পাল

ঢাকের বোলে আশ্বিন মাসে এখন শরতের আগমন ঘটেছে। দেখতে দেখতে ভাদ্র মাস শেষ হয়ে এবার উমার আসার পালা, আর উমা এলেই তো বাঙালির বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো । দত্তবাড়ির দুর্গোৎসব এবারে ত্রিশ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে তাইতো মহালয়া থেকেই পুজোর প্রস্তুতি একদম তুঙ্গে, সারা পাড়া হাজির হয়েছে এই বড়ো বাড়ির উৎসবে। দত্তবাড়ির এই উৎসব অনেক বছর ধরে চলে আসছে, বলতে গেলে বনেদি বংশের এক বাঙালিয়ানার ছাপ রাখে ।

বাড়ির কর্ত্রী থেকে মহিলারা সবাই ব্যস্ত নানা ধরনের কাজে, এই বাড়ির মেজোবউ অনুরূপা দেবী, তার বছর সাতেকের একটি ছোট্ট ছেলে আছে, নাম দিব্যমান ওরফে দিব্য।

পঞ্চমীর দিনে সকাল সকাল ঘুম ভাঙতেই দিব্য তার মাকে ঘরে না দেখতে পেয়ে একছুটে নীচে চলে যায়। বাড়ি ভর্তি লোক দেখে সে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও তার দুই চোখ তার মাকে খুঁজতে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পর, দিব্য পিছন দিক থেকে গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে--

---‘‘ আমাদের বাড়ির তো পুজো,কতো লোক উফ, আমি তো তোমাকে খুঁজে না পেয়ে এতো লোকের মধ্যে নিজের বাড়িতেই হারিয়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে, এতো লোক এসেছে কেন? ”

---‘‘ আমাদের বাড়িতে তো দুর্গাপুজো হচ্ছে বাবু। তো এই পুজোতে পাড়ার লোকেরা আসবে না? তাই কখনো হয় নাকি??”

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এই বছর প্রথম দিব্যর এই উৎসব দেখা, এর আগে দেখে থাকলেও অতো গভীরভাবে কখনো দাগ কাটেনি তার মনে। তার মনে পড়ে স্কুলের নোটিশ পড়ে হেডম্যাম বলেছিল-

---‘‘ দুর্গাপুজোর জন্য চতুর্থী থেকে লক্ষ্মী পুজো অবধি বিদ্যালয় ছুটি থাকবে ”

কিছুসময় পরে বিষয়টি দিব্যর বোধগম্য হলে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করে-

---‘‘ মা, দুগ্গাপুজোর গল্প তো আমি শুনেছি,কিন্তু এতোগুলো দিন কী কী হয় আমায় একটু বলোনা। ”

তার মা বিরক্তিকর সুরে বলে ওঠে-

---‘‘ উফ্, দিব্য এখন আমায় বিরক্ত করিসনা তো, আমার এখন হাজারটা কাজ রয়েছে, এখন অতো প্রশ্ন করিসনা, রাত্রে ঘুমানোর সময় সব গল্প বলবো। ”

যথারীতি রাত্রিবেলা সে তার মাকে একই প্রশ্ন আবার করলে, তার মা বলে-

---‘‘ দেখ দিব্য পুজোর এই এতোগুলো দিন প্রথমত তোকে পড়তে হবেনা, তোর পড়া ছুটি,তারপর রোজ নতুন জামাকাপড় পড়ে আনন্দ,মজা করতে পারবি দাদা, দিদিদের সাথে, এরপর ক্যাপ বন্দুক কিনে আনবে তোর কাকাই, আর পুজোর সব দিনে ভালো ভালো খাবার রান্না হবে, যেগুলো দেখবি তোরও খুব পছন্দের। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সবাই মিলে ঠাকুর দেখতে যাওয়া আরও অনেক কিছু। এই দুর্গাপুজোতে সবার আনন্দ করা উচিত,কারোর মন খারাপ করতে হয়না”

গল্প শেষ হলে, দিব্য বলে ওঠে-

---‘‘ আরে বাস্ দুগ্গাপুজো তো খুব আনন্দের, পড়তে হবেনা, নতুন নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ, ক্যাপ, বন্দুক, ঠাকুর দেখা ভারী মজা ভারী মজা। ”

আনন্দ পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দিব্য বলে-

---‘‘ আচ্ছা মা, পুজোর এই এতোগুলো দিন তুমি বললে ভালো ভালো রান্না হবে,ভোগপ্রসাদ হবে সেগুলো বাড়ির সবাই খাবে?”

---‘‘ হ্যাঁ, সবাই খাবে, তুই ও তো খাবি চেটেপুটে ।”

---‘‘ আচ্ছা মা, একটা কথা বলবো? ”

---‘‘ বলো সোনা আমার। ”

---‘‘ মা, তুমিই তো বললে দুগ্গাপুজো আনন্দ করার উৎসব, তাহলে কালকে থেকে তো পুজো শুরু , ভোগপ্রসাদ হলে আমাকে স্কুলের টিফিনবক্সে একটু দেবে? ”

একটু অবাক হয়ে অনুরূপা দেবী জিজ্ঞাসা করলো-

---‘‘ কেনোরে? কালকে তো স্কুল ছুটি, তাহলে তুই টিফিনবক্সে ভোগপ্রসাদ নিয়ে কী করবি? ”

কিছুসময় ধরে দিব্য চুপ করে থাকে, তারপর সে ভয়ে ভয়ে বলে-

---‘‘ তুমি বকবে না তো মা? ”

---‘‘ আরে, আগে তো বল, না শুনে বকবো কেনো? ”

---‘‘ আসলে মা আমার স্কুলের পাশে যে বস্তিটা আছে ওখানে আমার সাতটা বন্ধু থাকে,ওরাও আমারই বয়সী ওদের খুব কষ্টগো মা, ওরা খুব গরীব, ওরা পড়াশোনাও করেনা,

ঠিকমতো দুবেলা ওরা খেতেও পায়না। আমি স্কুল যাওয়ার সময় ওদেরকে দেখি, আমার খুব কষ্ট হয় মা, আর এই পুজোতে ওদের ভালো জামাকাপড়ও কেনা নেই নিশ্চয়ই, ওদের সব জামাকাপড় গুলো ছেড়া। এবারে তুমি বলো মা, আমার বন্ধুরা কাল ভোগপ্রসাদ না খেলে বা নতুন জামাকাপড় না পড়লে আমি থালা সাজিয়ে ভোগপ্রসাদ খাওয়া বা নতুন জামাকাপড় পড়বো কী করে?

আমার তো অনেকগুলো নতুন জামা হয়েছে,ওখান থেকে পাঁচটা জামা আমাকে দেবে গো মা?

এই বলে দিব্যর চোখের কোণটা জলে ভরে উঠলো, ছেলের এই কথা শুনে অনুরূপা দেবী স্তব্ধ হয়ে গেলো, সে তার ছেলের এক মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আজ পেলো।

---'' কীগো মা, দেবে তো? ''

---'' হ্যাঁরে সোনা দেবো, শুধু একবাটি নয়, আরও অনেক দেবো, তুই আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাস। ''

পরেরদিন দত্তবাড়িতে জোরকদমে ষষ্ঠীর পুজো শেষ হলে, দুপুরবেলা দিব্য আর অনুরূপা দেবী বস্তিতে যায়।

অনুরূপা দেবী তার ছেলের হাতে একটা বড়ো টিফিনকৌটো আর কিছু নতুন জামা দিয়ে বলে -

---'' যাও ওদের দিয়ে এসো। ''

দিব্য আনন্দে একছুটে চলে যায় ওর বন্ধুদের কাছে , সবাইকে ভোগপ্রসাদ আর নতুন জামা সমানভাবে ভাগ করে দিল। নতুন জামা আর পুজোর ভোগপ্রসাদ পেয়ে ওরা যে কতোটা তৃপ্ত হয়েছে, কতটা আনন্দ পেয়েছে সেই প্রতিচ্ছবি ওদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে আর দিব্যর সুন্দর মনের আদর্শ সমাজের যোগ্য নাগরিক হয়ে ওঠার শিক্ষা, গভীর বন্ধুত্ব আর বন্ধুর প্রতি হৃদ্যতার পরিচয় পেয়ে অনুরূপা দেবী আজ সত্যি খুব খুশি। সত্যি তার ছেলে যেনো দত্তবাড়ির গর্ব।

সত্যি এ যেনো ''বন্ধুত্বের শারদোৎসব।''

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন -

সোমসপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪। জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান।
৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

কার্তিক চন্দ্র দে
উপ প্রধান

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

পুষ্প ভান্ডারী
প্রধান

ফণীরানী

প্রভাস পাল

যাত্রার স্বর্ণযুগে যেসব যাত্রা অভিনেতা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন তাদের মধ্যে ফণী ভট্টাচার্য অন্যতম। ফণী ভট্টাচার্যই যাত্রার ফণীরানী। সে সময় ফণীরানী, বাবলিরানী, ছবিরানী, শতদল, হরিগোপাল, চপলরানী স্ত্রী চরিত্রে দাপটে অভিনয় করে যাত্রামঞ্চ কাঁপিয়েছেন। পুরুষের দৃঢ়তা অথচ মহিলা কণ্ঠ, নিখুঁত মহিলা সাজপোশাক, হাঁটাচলা এবং কথা বলার ঢং নারী জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না, ঘাত প্রতিঘাত দৃঢ়তার সঙ্গে পরিবেশন করতেন মঞ্চে। ফণীরানী কখনও বিদ্যাসাগরের মা, কখনও রামায়ণের রহস্যময়ী কৈকেয়ী, কখনও বা মহাভারতের বৈচিত্রময়ী কুন্তী। এসব চরিত্রে অন্তর ছোঁয়া অভিনয় করতেন ফণীরানী।

ফণীবাবুর বৈশিষ্ট্য ফিনফিনে ধুতি দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরা, ফুলহাতা শার্ট, সুদর্শন মুখশ্রী বাহারি একমাথা চুল ও উজ্জ্বল দুটি চোখ। দলে ছুটি থাকলে চারচাকা গাড়িটি বাড়ির কাছাকাছি রেখে হেঁটে আসতেন বাড়িতে। ফুরফুরে মেজাজ। গলায় তিন ভরি সোনার হার। হাতে মানিব্যাগ। দুহাতে টাকা খরচ করতেন। তাঁকে একটু দেখার জন্য মানুষের সেকি উঁকিঝুঁকি! চিৎপুরের অন্যান্য যাত্রা দলগুলো ফণীরানীকে চুক্তিবদ্ধ করার জন্য দিতো অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের টোপ। যাত্রাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। যাত্রা অন্ত প্রাণ তিনি। ফনীবাবু আর যাত্রা এক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কখনও যাত্রা পাগল কেউ ফণীদার সঙ্গে দেখা করতে এলে - অবারিত দ্বার।

এক বিচিত্রানুষ্ঠানে ফণীবাবু প্রায় কুড়ি বছর আগের একটি পালার ডায়লগ একটানা পরিবেশন করলে মঞ্চে উপস্থিত চিত্রাভিনেত্রী মাধবী মুখার্জি বলেছিলেন - অসাধারণ! মহামান্য নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, '' দেহ পট সনে নট সকলি হারায়''। ফণীবাবুও তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী চরিত্র ছেড়ে পুরুষ চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। তবে, উনি উপার্জন করেছেন ; সঞ্চয় করেননি। তাই, আর্থিক সংকটে পড়েছেন। কিন্তু, লড়াই ছাড়েননি। ভুবনভুলানো হাসি উবে যায়নি। খুশি উপচে পড়ত তাঁর হাঁটা চলায়। শেষদিকে তিনি বিভিন্ন ক্লাবে যাত্রা নির্দেশনার কাজ শুরু করেন। তাঁর আর্থিক সংকটমোচনের জন্য এগিয়ে আসে নাট্যপ্রেমী নতুন প্রজন্ম। পৌরসভা ওনার বাড়িতে জল সংযোগের ব্যবস্থা করেন। দেওয়া হয় আর্থিক সহায়তাও।

ফণীরানীর জীবনী প্রকাশ করেছে অনেক সংবাদপত্র। টেলিভিশনে 'ক্যামেরা চলছে' অনুষ্ঠানে ফণীরাণী জীবনী প্রচারিত হয় । ফণীরানীর প্রতিবেশী সুরসাধক সলিল দাস ও চায়না দাসের কোন্নগর সুরপঞ্চম যাত্রা সংস্থার মাধ্যমে আকাশবাণী কলকাতার কৃষি কথার আসরে যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পয়লা বৈশাখ এবং রথযাত্রার দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে চিৎপুরের পেশাদারী যাত্রার সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপন দিত আগামী যাত্রাপালার। উনি সেই সংবাদপত্রের পাতা উলটে উলটে এই লেখককে দেখে বলতেন, '' আজ যাত্রা বিজ্ঞাপনে আমার ছবিও নাই ; নামও নাই। এখন আমি ফণীরানী নয়। শুধুই ফণী ভট্টাচার্য। আমি এখন মনিহারা ফণী। ''

ফণীরানী মনিহারা হননি। যাত্রামনস্ক মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। জীবন নাট্যের সফল প্রযোজনায় তিনি সার্থক। তাঁর পরিশ্রম, ত্যাগ, দৃঢ়তাই তাঁকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ফণী ভট্টাচার্যের বাবা উত্থানপদ ভট্টাচার্য ও মা শংকরী ভট্টাচার্য ফণীর লেখাপড়ায় অমনোযোগ দেখে হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের আগ্রহ দেখে মুগ্ধও হয়েছিলেন। উৎসাহ দিয়েছিলেন। ফণীবাবু একটি মদগন্ধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় চাকরি করতেন। আর বিভিন্ন ক্লাবে, বারোয়ারির আসরে যাত্রায় থিয়েটারে অভিনয় করতেন। তা করতে করতেই চিৎপুরের পেশাদার যাত্রাপার্টি 'নট্য কোম্পানি'তে সুযোগ পান। এবং টানা বাইশ বছর ওই দলে নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রের মধ্যে কুঁজিবুড়ি মন্থরার অভিনয় জনমানসে বঞ্চাপক সাড়া জাগায়। বিদ্যাসাগরের মায়ের ভূমিকায় তিনি ছিলেন অনবদ্য। শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাও পান এজন্য। ' ফণীরাণী'-র খঞ্চাতি অর্জন করেন। তারপর আরও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে 'ছত্রপতি শিবাজী' পালায় জিজাবাঈ এর ভূমিকায় বিশেষ সম্মান অর্জন করেন। উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনোনীত ভাতা পেতেন। বর্তমানে ওনার স্ত্রী তা গ্রহণ করেন। কোন্নগরের আদরের ফণীরানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। এবং পরলোক গমন করেন ২০১১ খ্রিস্টাব্দে।

যাত্রামোদী সকল মানুষের মনের মনিকোঠায় তিনি থেকে যাবেন চিরদিন।

জীবন বদলের গল্প

সমাদৃত দাস

প্রাক-কথন....

সেদিন হয়েছে কী, তিতির বাবা তিতির ওপর ভারী চটে গেলেন। বললেন,''কী রে তুই আজও স্কুলে যাবি না? বলি প্রতিদিন হচ্ছেটা কী? বাড়িতে বসে থাকলে হবে? অত স্কুল কামাই করলে তো গার্জেন কল করবে। তখন ?''

তিতি বলল,''আমার স্কুল যেতে মোটেও ভালো লাগে না। ওই বসে বসে ক্লাস করো, একদম বোরিং ব্যাপার। বিরক্ত লাগে।''

বাবা বোধহয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পরক্ষণে মা এসে সব ঘেঁটে দিলেন। বললেন,''আহহা! ছাড়োই না। তিতি স্কুলে যাবে না, সেটা ওর ব্যাপার। ও বুঝে নেবে। আর ওকে একদম কষ্ট দেবে না এই বলে দিলাম।''

''লক্ষ্মী সোনা না ছাই। যত্তসব আদিখ্যেতা!'' বলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ।

তিতির কথা.....

তিতি মেয়েটা এমনি দুষ্টু-মিষ্টি মেয়ে। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু মুড অফ হয়ে গেলেই তখন মুখটা বাংলার পাঁচের মতন হয়ে যায়। বাবা মায়ের স্নেহের কন্যা বলে কথা। কিন্তু ওই যে ওর দুটো ব্যারাম রয়েছে। এক, ও স্কুলে যাবে না। অত্যধিক পরিমাণে স্কুল কামাই করে। ওই সপ্তাহে এক-দুই দিন স্কুল যায়। আর দুই, পাড়ার কিছু বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুঁটি করবে। বাবা চান যে মেয়ের মাথায় সুবুদ্ধি হোক। সে বিদ্বান হোক। তাই জন্য তো তিনি সময়ে সময়ে মেয়েকে দু-চারটি কথা শুনিয়ে দেন। আসলে বাবা মানুষটা কিন্তু তাঁর মেয়েকে খুবই ভালোবাসেন। সেইজন্য তো তিনি সর্বদা চান তাঁর একমাত্র মেয়ের পড়াশোনার কোনো ক্ষতি না হোক। কিন্তু তিতির মায়ের কথা হল, তিতি যেটাতে কষ্ট ও দুঃখ পায় সেটাতে কোনো মতে ভুলেও যেন কেউ আঘাত না করে। তার কারণ, মায়ের কথায়, তাঁদের বাড়িতে তিতি হল একমাত্র মেয়ে। আর মেয়ে মানেই বাড়ির লক্ষ্মী। তাই ললনা যা চাইবে সেটাই তিতির বাবা দিতে বা করতে বাধ্য। এবার কিছুতেই বাবা বোঝাতে পারেন না যে পড়াশোনার উপকারিতা। পড়াশোনা না করলে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হাতে হারিকেন নিয়ে ঘুরতে হবে কিন্তু তাতেও যে আলোর দিশা খুঁজে পাবে সেটা কিন্তু নিশ্চিত নয়। আর প্রত্যুত্তরে তিতির মা বলে চলেন, তিতি যেহেতু মেয়ে, কাজেই তাকে অত পড়াশোনা করিয়ে কোনো লাভ নেই। উপরন্তু পড়ানো মানে পয়সা ধ্বংস। একটু বড় হলে ভালো কোনো পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করে সুখে শান্তিতে ঘর কন্যার কাজ করবে। কিন্তু তিতির বাবা চান যে তিতি যেহেতু তাঁর একমাত্র মেয়ে তাই সে পড়াশোনা শিখুক। মানুষের মতো মানুষ হোক। বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা করুক এবং চাকরি বাকরি করুক। কিন্তু মায়ের যুক্তি তর্কের সঙ্গে তার বাবা কিছুতেই যে পেরে ওঠেন না। এটাই হয়ত তাঁর দুর্ভাগ্য। এখন তিতি পড়ে ক্লাস সিক্সে। আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছে, এখনই তো জোরকদমে পড়াশোনা করতে হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? এই নিয়ে দিন-রাত্রি বাড়িতে ঝগড়া ঝামেলা হয়েই চলে। এই ঝগড়ার যে কোনো শেষ নেই।

ঝকমারি....

এই বাড়িতে শিক্ষা নিয়ে সত্যিই যে বড় সমস্যা সেটা নিশ্চয় আর বলতে হবে না। যে মেয়ে স্কুলে যায় না, প্রাইভেট টিউশন এ যায় না, সে মেয়ে কি আদৌ পড়াশোনা করবে? তার বিন্দুমাত্র শেখার আগ্রহ যে নেই। বাবার চাপে পরে যেটুকু হয় আর কী! আসলে তিতি খুব জেদি, একগুঁয়ে মেয়ে। প্রচণ্ড গোঁয়ার্তুমি করে। করব না তো করব না, খাব না তো খাব না, এই রকম ব্যাপার। বাড়িতে প্রতিদিন যে খবরের কাগজটা আসে, তাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দেয় তিতি। বাবাকে শান্তি করে খবরের কাগজটা পড়তে দেয় না। তাই বাবা বাধ্য হয়ে ভোর ভোর ঘুম থেকে ওঠেন। তারপর যখন কাগজ ওয়ালা কাগজ দেয়, ঠিক তৎক্ষণাৎ অফিসের ব্যাগে খবরের কাগজটা ভরে নেন তিনি। এবং অফিসে টিফিন আওয়ারে টিফিন খেতে খেতে কাগজটা পড়েন তিনি। কী ঝকমারি ব্যাপার-স্যাপার রে বাবা?

গল্পের বই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড.....

সেদিন বাবার অফিস ছুটি ছিল, তাই সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ তাঁর ঘর নিশ্চুপ ছিল। তিনি একাকী মনে শান্ত দুপুরে বসে মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন। হঠাৎ করে তিতির আগমন ঘটল। প্রথমে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তিতি যে বাবা কী করছে? সেটা খুব মনযোগ দিয়ে দেখছিল তিতি। কখনও

তার বাবার মুখে এক গাল হাসি, আবার কখনও চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল তো আবার কখনও মুখটা গুরু গম্ভীর। এই দেখে তিতির হাসি পেয়ে গেল। বাব্বা! বাবা কি পড়া মুখস্থ করছে নাকি ? তিতি মুখ টিপে টিপে হাসছে দেখে বাবা বললেন,''দিলি তো আমার ব্যাঘাত ঘটিয়ে। কনসেন্ট্রেশনটা পুরো নষ্ট হয়ে গেল, তোর জ্বালায়। কী চাই এখানে ?''

তিতি বলল,''আসলে তোমাকে একটু জ্বালাতন করতে এলাম।''

ওর বাবা একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,''হ্যাঁ, ওই তো তোমার কাজ। কোনোদিন চুপটি করে বসে একটা গল্পের বই পড়ে দেখেছিস ? এই যে গত বইমেলা থেকে এতগুলো বই কিনে আনলাম সেগুলো ? অবশ্য নিজের ক্লাসের বাংলা বইয়ের গল্পগুলো ঠিক-ঠাক পড়িস না, তুই আবার গল্পের বই পড়বি? (একটু হো-হো করে হাসলেন তিনি)

তিতি বলল,''কী বললে তুমি ? আমি পড়ার বই পড়ি না। মানছি গল্পের বই পড়ি না, কিন্তু তার মানে''

বাকিটা আর শেষ হল না। আর মধ্যে হঠাৎ করে তিতির মায়ের আবির্ভাব ঘটল।

তিতির মা বললেন,''এই কী হয়েছে রে তিতি ? কাঁদছিস কেন ?''

তিতি কান্নার অভিনয় করে বলল,''এই দেখো না মা, বাবা বকছে।''

তারপর আর কী, তিতির মা ওর বাবাকে আচ্ছা করে ধমক এবং বকুনি উভয়ই দিলেন। বাবাও তিতির ওপর প্রচন্ড বিরক্ত হলেন। রাগে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তিতির রাতারাতি ভোল বদল.....

সেদিন রাতে তিতির মায়ের এক বান্ধবীর জন্মদিন ছিল। আর জন্মদিন সপরিবারের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু তিতি ঘরকুনো। বাইরে বেরোতে ওর ভালো লাগে না। তাই ওর মা ওর জন্য চিলি চিকেন বানিয়ে রেখেছিলেন, মেয়ে খাবে বলে। বাবা নেমন্তন্ন বাড়িতে একটু নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন বটে কিন্তু ওর মায়ের নিষেধ এর পর আর কিছু বললেন না তিনি। তারপর তিতির বাবা এবং মা দু-জনে একসাথে চলে গেলেন। এদিকে তিতির একা একা বসে বোরিং লাগছিল। তাই ভাবছিল, কী করা যায় ? কী করা যায় ? ভাবতে ভাবতে তিতি তার বাবার ঘরে গেল। সেখানে কিছু কমিক্স এর বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরেছিল। সেখান থেকে একটা বই হাতে তুলে নিল তিতি। তারপর প্রথম পাতা খুলে কাহিনীর ছবিগুলো দেখতে লাগল। অতঃপর টুকরো টুকরো লেখাগুলোও পড়তে লাগল। এইভাবে আস্তে আস্তে প্রায় অর্ধেক কমিক্স এর বইটাই পড়ে শেষ করে ফেলল তিতি। বাবা-মা নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে এসে দেখেন তাদের আদরের দুলালী ঘরে বসে বই পড়ছে। এ যে রাতারাতি ভোল বদল। বাবা তো এই দৃশ্য দেখে ভারী অবাক হয়ে গেলেন। এও কী সম্ভব? বাবাকে আসতে দেখে তিথি লাফিয়ে উঠে বলল,''বাবা,বাবা, তুমি না ঠিকই বলেছিলে, বইয়ের থেকে ভালো কিছু এ জগতে আর নেই। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি পাপা। আমি কাল থেকে রোজ স্কুলে যাব। মন দিয়ে পড়াশোনা করব। আর বন্ধুদেরও বলব, গল্পের বই পড়তে। আর বলব, গল্পের বই পড়ার উপকারিতা।''

এই কথা শোনবার পর বাবার চোখের কোণে জল চিক চিক করতে লাগল। তবে সেটা দুঃখে নয়, পরম আনন্দে।

শেষ কথা.....

এখন বিচ্ছু তিতি সোনা মেয়ে হয়ে গেছে। প্রতিদিন স্কুলে যায়, পড়াশোনা করে, বাইরে খেলতে বেরোয়। একদম দুষ্টুমি করে না। বাবাকে মোটেও বিরক্ত করে না। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্পের বই পড়ে। মা-বাবা দু-জনে ওর ভোল বদল দেখে সত্যিই উৎসাহিত বোধ করলেন। যাক বাবা তাহলে এতদিনে মেয়েটার সুবুদ্ধি হয়েছে। আর হ্যাঁ, তিতির মাও কিন্তু তার ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন পড়াশোনা ও গল্পের বইয়ের উপকারিতা। আচমকা তিতি ছুটে এল এবং আদুরী গলায় বলল,''বাবা, বাবা আর কিছু গল্পের বই কিনে দেবে ?''

খবর সোজাসুজি
খবর সোজাসুজি
চোখে চোখ রেখে কথা বলে !!!

কাছের মানুষ

মিলি ঘোষ

বারান্দায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে শ্রুতি সামনের ছোট মাঠটার পাশে বটগাছটাকে দেখছিল। কত বছরের গাছ কে জানে। গাছটাকে ঘিরে থাকা ভাঙাচোরা বেদিতে তির্যক রোদ গাছটির আভিজাত্য বাড়িয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে শ্রুতির আজ হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। সেই কবে বাবা এসে রেখে গেছিলেন ওকে। আর আসেননি। বাবার মুখটা ঠিক মনেও পড়ে না আজকাল। বাবা কি এখন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে? কত বয়স হয়েছে বাবার? শ্রুতির নিজেরই বা কত বয়স হলো? নাহ্, আর কিছু ভাবতে চাইল না শ্রুতি। ও শুধু জানে পরিশ্রম আর হাসি মানুষকে অনেকটাই সুস্থ রাখে।

সকালের চা, ব্রেকফাস্ট শ্রুতি নিজের হাতে বানায়। এ সবই ডাক্তার নার্সদের জন্য। রান্নার মাসির রান্নাঘর আলাদা। বেশ বড়ো সেটা। সে যা যা করে পেশেন্টদের জন্য। তবে দুপুরের আর রাতের রান্না সকলেরই এক। রাতে রান্নার মাসি আসে না। রাতটা একজন সহকারী নিয়ে শ্রুতি সামলে দেয়।

ডাক্তারবাবু আর সিস্টারদের সঙ্গে থেকে অনেক কাজ শিখেছে শ্রুতি। প্রেশার মাপতে পারে, ইনজেকশন দিতে পারে, স্যালাইন দিতে পারে। তবে এই ধরণের কাজের দায়িত্ব শ্রুতিকে কখনওই একা দেওয়া হয় না। কেউ একজন পাশে থাকেনই।

এক এক রাতে ঘুমের মধ্যে ঘ্যানঘ্যানে কান্নার আওয়াজ শুনে উঠে গেছে শ্রুতি। নিজের ঘুম নষ্ট করে রাত জেগে ওই অসহায় মানুষটিকে গল্প বলে আদর করে ঘুম পাড়িয়েছে। যদিও ডাক্তার নার্সরা শ্রুতিকে এই ধরণের কাজ থেকে দূরে রাখারই চেষ্টা করেন। জানতে পারলে বারণ করেন। এমন রাত তো শ্রুতির নিজেরও কেটেছে এক সময়। তাঁরা চান না শ্রুতির মনে এই নিয়ে নতুন করে চাপ পড়ুক।

আনন্দ নিকেতন। মানসিক হাসপাতাল। গড়পড়তা আর পাঁচটা হাসপাতালের মতো এটি নয়। এখানে ধৈর্যই শেষ কথা। আর দরকার এক সমুদ্র আন্তরিকতা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও শ্রুতির বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ওর বাবা যে ফোন নম্বর দিয়েছিলেন সেটির কোনও অস্তিত্ব নেই। ওই ঠিকানায় এখন বহুতল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, সব বাড়ি ছাড়িয়ে। শ্রুতিদের কেউ চেনেই না। পুরোনো বাসিন্দাদের থেকেও আশাপ্রদ খবর কিছু পাওয়া যায়নি। এই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে শ্রুতির বাবা পরিবার নিয়ে কোথায় চলে গেছেন ঠিক করে কেউ বলতেই পারল না। সেই থেকে রয়ে গেছে শ্রুতি আনন্দ নিকেতনের সঙ্গে সুখে দুঃখে।

মধ্যিখানে একটা সময় স্মৃতিভ্রম হলেও এখন শ্রুতি

ছোটোবেলার কিছু ঘটনা মনে করতে পারে। ওদের বাড়ির পিছন দিকটায় একটা লাউ গাছ ছিল ছাদ পর্যন্ত দড়ি দিয়ে টানা। আর ছাদের অন্য দিকে মা তাঁর একটা বেগুনী রঙের ফুল ফুল শাড়ি শুকোতে দিতেন। আরও কিছু জামাকাপড় মেলা থাকত। শ্রুতি ওর ভাই রাজুর সঙ্গে ওই জামাকাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলত। একবার রাজু টানাটানি করে দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিল। মা কিন্তু এসে শ্রুতিকেই চুলের মুঠি ধরে পিটিয়েছিলেন। রাজুর মুখটা আবছা মনে পড়লেও মা'র মুখটা শ্রুতি মনেই করতে পারে না। তবে, বাবার হাত ধরে আনন্দ নিকেতনে আসার দিনটার কথা একটু হলেও মনে আছে ওর।

এখান থেকে সুস্থ হয়ে আপনজনদের সঙ্গে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে যাবার সময় বহু মানুষ বলে গেছে, তোমাকে মনে থাকবে শ্রুতি। শ্রুতি জানে, বাড়িতে পা দিয়েই এরা ওকে ভুলে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। শ্রুতিকে মনে রাখা মানে আনন্দ নিকেতনে কাটানো প্রতিটি দিন প্রতিটি রাতকেও মনে রাখা। নাহ্, কে চায় এ'সব মনে রাখতে? সুস্থ হতেই তো আসা। পিছনে তাকালে বিপদ আবার কড়া নাড়তে পারে।

আনন্দ নিকেতনের ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে ঘর পরিষ্কার করার ছেলেটিরও পরিবার আছে। বাড়িঘর, নিজের লোক আছে। কিন্তু শ্রুতির বাড়ি কই? আপনজন কই? শ্রুতি যখন এ বাড়িতে এসেছিল তখন ওর কিশোরী জীবনের বালিকাবেলা। তারপর সেই কৈশোর যৌবন সব পার করেছে শ্রুতি আনন্দ নিকেতনের আলো বাতাস গায় মেখে। এতগুলো বছরে কোনও আপনজন এসে বলেনি, শ্রুতি বাড়ি যাবি চল। চিনতে পারছিস? আমি তোর মা! তোর বাবা! ভাই!

এ বাড়ির চারপাশটা কিছুটা নিঝুম। বেশি সকালে পাখির ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। এ'জন্যই ভোরের ট্রেনের সুস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসে।

শ্রুতি দাঁত ব্রাশ করার সময় আকাশটা দেখছিল। কেমন

একটা ধুপছায়া রঙ লেগেছে আজ। চা বসাতে গিয়ে চাপা গুঞ্জন কানে এলো। দু'একবার তাকিয়েছে শ্রুতি দরজার দিকে। কী জানি, গোলমেলে কোনও পেশেন্ট এসেছে হয়তো। শ্রুতি হাত চালিয়ে কাজ সারতে থাকে। দরকার বুঝলে ডাক্তারবাবুরা ওকে ডাকবেন। হ্যাঁ, ডাক পড়ল।

একজন সিস্টার এসে বললেন, ''শ্রুতি একটু নিচে চলো তো। এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। তুমি তাঁকে চেনো কিনা দেখো তো।''

এতটা অবাক শ্রুতি বহুকাল হয়নি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ডক্টর ঘোষালের গলা পাওয়া গেল।

কাকে যেন বলছেন, ''আপনি কোনও রিঅ্যাক্ট করবেন না। একটা কথাও বলবেন না। শ্রুতি আপনাকে চিনতে পারে কিনা আমরা দেখব।''

ভিজিটর'স রুমে পা দিয়ে থমকে গেল শ্রুতি। কোথাও কি দেখেছি একে? নাহ্, এরকম দেখতে তো কত লোকই থাকে। তবুও সিস্টারের পাশে পাশে হেঁটে ভদ্রলোকের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। ভালো করে দেখতে লাগল। অন্য ডাক্তার নার্স একে একে সকলেই এসে দাঁড়িয়েছেন। সবার নজর শ্রুতির দিকে।

কিছুটা সময় কেটে যায়। এই সময়ের মধ্যে শ্রুতি কখনও ঠোঁট উল্টেছে, কখনও নিজের মনেই নাহ্ বলে দুদিকে ঘাড় নেড়েছে। হঠাৎ শ্রুতির চোখ মুখ পাল্টে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে দ্রুত পায় এগিয়ে গিয়ে বসে থাকা ভদ্রলোকের কাঁধ দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে জোর ঝাঁকুনি দিলো, ''তুই রাজু না?''

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান।

বলেন, ''হ্যাঁ রে দিদি। আমি রাজু। বাড়ি চল দিদি। তোকে আমি নিতে এসেছি।''

শ্রুতি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে আবার সিস্টারের পাশে গিয়ে তাঁর হাতটা শক্ত করে ধরল।

ডক্টর ঘোষাল রাজুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তা রাজদীপবাবু, হঠাৎ দিদিকে মনে পড়ল?''

রাজু চোখের জল মুছে উত্তর দিলো, ''হঠাৎ না ডাক্তারবাবু। দিদিকে আমরা একদিনের জন্যও ভুলিনি। দিদি সুস্থ হয়ে গেছে সে খবর আমরা পেয়েছি অনেক দেরিতে। তখন এমন দিন গেছে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আসতে পারিনি।''

''কী রকম দিন গেছে বলুন তো? মানসিক ভাবে সুস্থ হয়ে ওঠা একজন মানুষকে অন্য পেশেন্টদের সঙ্গে রাত কাটানোর থেকেও খারাপ দিন গেছে আপনাদের?''

মাথা নিচু করে রাজু।

ডক্টর দত্ত এগিয়ে এসে জানতে চান, ''পরিবারে কে কে আছেন এখন?''

''বাবা নেই। মা অসুস্থ। আমার স্ত্রী আর দুই ছেলে।''

''বুঝেছি। মা'কে দেখার জন্য আয়া দরকার।''

''না, না। বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু। দিদিকে দেখার জন্য মা খুব ছটফট করছে।''

হঠাৎ শ্রুতি বলে বসে, ''আমি যাব না তোর সঙ্গে রাজু। মা'র মুখ আমি ভুলে গেছি। মনেও করতে চাই না।''

সিস্টারের হাত ধরে ধীরে ধীরে ওপরে চলে যায় শ্রুতি।

শ্রুতি চলে গেলে ডক্টর ঘোষাল বললেন রাজুকে, ''শ্রুতিকে অসুস্থ করেছে ওর মা। ছেলের প্রতি ছিল তাঁর অন্ধ স্নেহ। আর শ্রুতির ওপর চলত অকথ্য অত্যাচার। এর থেকে ভীষণ এক মানসিক অবসাদ ওকে গ্রাস করে। যার পরিণতি আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন।''

''কিন্তু মা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে জর্জরিত।''

ডক্টর চ্যাটার্জি প্রায় ধমকের সুরে বললেন, ''নাটক বন্ধ করুন রাজদীপবাবু। অনুতাপ হতে আপনার মায়ের ছাব্বিশটা বছর লাগল? আপনি আসুন রাজদীপবাবু। আর দ্বিতীয় দিন আসবেন না এখানে। আপনার অনুতপ্ত মা'কে গিয়ে বলুন, শ্রুতি এখানে ভালো আছে। এখানেই থাকবে।''

শ্রুতির ঘরের পিছনের জানলা দিয়ে রাস্তাটা দেখা যায়, যেটা সোজা বাস স্টপেজের দিকে গেছে। রাজু চলে যাচ্ছে। শ্রুতি দেখছে জানলায় দাঁড়িয়ে। হাঁটাটা একই আছে। সেই ছোটবেলার মতো। শ্রুতির চোখের সামনে হঠাৎ একটা বেগুনী রঙের ফুলফুল শাড়ি উড়ে এলো। রাজু কি শাড়িটার আড়ালে চলে গেল! শ্রুতি শাড়িটা সরানোর চেষ্টা করল। হাওয়ায় শাড়িটা উড়ছে আর উড়ছে। শ্রুতি হাত বাড়িয়েও ধরতে পারল না।

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ

প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

হিমায়িত মন

তপন তরফদার

হিমের প্রভাবে অনেক বিষয় চাপা পড়ে গেলেও বিষয়টি মৃত হয়ে যায়না। কখন যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কেউ জানেনা। গল্পের যাদুকর আন্তান চেখভ বলেন, ''প্রতিটি ধূলিকণার গল্পকথন আছে। পাড়ার ওই লাইটপোষ্টটা, বকুল গাছটা, হলুদ-কালো পাড়ার নেড়ি সারমেয়টির ও নিজস্ব কাহিনী আছে, গল্পকথন আছে। আবার গল্পে 'টুইষ্ট'ও আছে। যারা জানার ঠিকই জেনে নেয়।'' লাইটপোষ্টের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাবার সময় নেই। যারা পাগলামি করে সময় কাটায়, তারাই কালির আঁচড়ে ওদের মর্মকথা বা ব্যথায় ব্যথিত হয়। হিমঘর থেকে তুলে এনে অনুসন্ধান করে, সময়ের অপচয় করে কিনা তা সময়ই বলবে।

এই মনমর্জিয়া বৃদ্ধাশ্রমে বেশ কয়েক বছর কেয়ারটেকারের কাজ করে মুখ। দেখলেই বলে দিতে পারি, কি ছিলেন, কেন এখানে এসেছেন। ইদানীং কিন্তু ওই সিনেমায় গল্পে যা দেখায়, বাড়ির লোকজন জঞ্জালের মতো এখানে ফেলে দিয়ে যায় তা কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে সত্যি নয়। ছায়া দস্তিদার নিজের উদ্যোগে ছেলের বিয়ে দিয়ে অষ্টমঙ্গলার দিনে নিজেই চলে আসেন মনমর্জিয়ায়। পুত্রবধু কাকলি নিজে এসেছিল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ছায়াদেবী ফিরে গেলেন না, উপরন্তু বললেন, বৈদিক যুগে এই বয়সে বানপ্রস্থে যেতে হতো জীবনকে উপোভোগ করতে। শিখা ঘোষ দে, কয়েক বছর হলো এখানে এসে সবার ভোল পাল্টে দিয়েছেন। শিখার রুপের বহ্নি শিখা এখনো জ্বালিয়ে দিতে পারে। কিছু মানুষ মানবদেহে কি যন্ত্রপাতি নিয়ে জন্মায়, যার কোনো ক্ষয় হয়না। শিখার শিখা এখনো দীপ্তিমান। বয়স এখানে একটি সংখ্যা মাত্র।

শিখাদেবী নিজেরা আনন্দে থাকবেন বলে ছোট-খাটো অনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণ শুরু করলেন। পুরুষ যতোই সিংহ হোক, ওই সুন্দরী ললনার কাছে নেংটি ইঁদুর। শিখার মুখ থেকে শুধু নির্দেশ নির্গত হওয়ার অপেক্ষায়। ভাগ্যিস ওদের জীবন-সঙ্গিনীরা ধরাধাম ত্যাগ করেছেন, না হলে অমনমর্জিয়াদতে প্রতিদিনই কুরুক্ষেত্র হত। সিনিয়র সিটিজেনরা এখানে যে উদ্যমে উদ্যোগী হয়ে যা কাজ করে তা অনেক যুবা-পুরুষের কান কেটে নেবে।

শিখা দে সরস্বতী পুজোর উদ্যোগ নিয়েছেন। সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর মত সেজেগুজেই অঞ্জলি দিয়ে পাত পেড়ে পংক্তি ভোজ খেয়েছে। সন্ধ্যায় ভালোবাসার দ্বৈতগান, দ্বৈতআবৃতি, নাটকের সংলাপে জমজমাট অনুষ্ঠান। বাঙালির ভ্যালেনটাইনসডে সরস্বতী পুজার দিন তা প্রমাণ করে দিল।

আক্ষেপের বিষয়, ছায়াদেবী যিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আনন্দে বানপ্রস্থের জীবন কাটাবেন বলে এসেছেন তিনি কিন্তু নিজের ছায়াবৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসেননা। মহাজাগতিক সূত্র অনুযায়ী এক আকাশে দুটো সূর্য থাকতে পারেনা। সেই জন্যই কি ছায়াদেবীর এই পদক্ষেপ। ঠিক বুঝতে পারিনি। বুঝলাম প্রতিমার নিরঞ্জনের পরে।

এই সময়ে গোধুলিরই দেখা মেলেনা। দুপুরের পরই ঝুপ করে প্রভাকর প্রভা বন্ধ করে দেয়। অন্ধকার করে দেয় ধরিত্রী। সরস্বতীকে ধুনুচি নাচ দেখিয়ে ভাসান দেওয়া হবে। নাচ চলছে তো চলছেই। এত এনার্জি, এত প্রোটিন কোথা থেকে আসছে কে জানে। রাত হলেও অসুবিধা হবেনা। বৃদ্ধাশ্রমেই সুসজ্জিত পুকুর আছে। আবাসিকরা বাতায়ন থেকেই দিঘির সৌন্দর্যের স্বাদ ফুলের ঘ্রাণ, গ্রহণ করে। কনকনে শীতের রাত।প্রতিমা নিয়ে পুকুরে আমাকেই নামতে হবে।

প্রদীপ্ত হাজরা পাইলট ছিলেন। সবসময় বিদেশের গল্পগুজবে খই ফুটান। অনেক জানে, অনেক খেয়েছে, অনেক কিছু করেছে, ভাগ্যের পরিহাস না এটাই নিয়তি যার জন্য এখানে থাকতে হচ্ছে। উনি কথার কলাকৌশলে সুন্দর উপস্থাপনা করেন। সবাই শোনে। হাজরা স্যার বলতে শুরু করলেন , হিমায়িত জলে জাপানে এক বিরাট উৎসব হয়। যার নাম হাদাকা মাতসুরি বা নগ্ন পুরুষদের উৎসব। স্রেফ একফালি ন্যাকড়ায় যতটুকু না হলে নয়, ততটুকুই লজ্জা নিবারণ করে হাজারো জাপানি পুরুষ এদিন হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা জলে নামেন। পশ্চিম জাপানের ওকায়ামার সাইদাইজি মন্দিরে হয় এই এতে উৎসব। হাজরা স্যারের গলায় যাদু আছে। সবাই সম্মোহিত। চোখ বড়োবড়ো করে বলেন মজার কথা কি জানেন? শিখারানী বলেন, বলুন বেশি রহস্য করবেন না। হাজরা স্যার শুরু করলেন, পুরোহিতের ছোঁড়া লাঠি পাকড়াতে ছোট্ট জলাশয়ের মধ্যে অসংখ্য লোকের হুড়োহুড়ি।

এই উৎসব অন্তত ৫০০ বছরের পুরনো।হাজারদশেক মানুষ ধর্মীয় এই অনুষ্ঠান পালন করেন কনকনে হিম জলে স্নান করে। তবে বিষয়টা স্রেফ বরফ জলে স্নান করা নয়। আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ষোল আনা। তাই পরনের ন্যাকড়ায় নিজের রক্তের গ্রুপ লিখে জলে লাফাতে হয়। আচমকা আহত হলে যেন রক্ত নিয়ে গন্ডোগোল হয়না।হাদাকা মাতসুরিতে যোগ দিয়ে পুরো অক্ষত শরীরে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। ঠেলাঠেলিতে কপাল ফুলে যাওয়া, হাত পা ছড়ে যাওয়া তো সামান্য ঘটনা। পদপিষ্ট

হয়ে মৃত্যুও হয়েছে বহু। কিন্তু দেড় ইঞ্চি ব্যাস আর আট ইঞ্চি লম্বা ওই পবিত্র লাঠিকে কব্জা করতে প্রাণসংশয় হলেও পিছপা নন জাপানিরা। তাঁদের বিশ্বাস, পুরোহিতের ছুঁড়ে দেওয়া ওই লাঠি যে পাকড়াও করবে, তার ভাগ্য খুলে যাবে। অতএব? হাজারদশেক মানুষ জলে ঝাঁপান। আচমকা নিভে যায় আলো, মণ্দিরের ওপর থেকে পুরোহিতরা শুরু করেন রহস্যময় মন্ত্রপাঠ। ওপর থেকে ঢেলে দেওয়া হয় হিমশীতল পবিত্র জল আর লাঠি। ভিড়ের চোটে শ্বাসরোধ হয়ে আসা স্বাভাবিক। আকাশ থেকে ছিটকে পড়া লাঠি ধরতে অন্ধকারেই লাফিয়ে ওঠেন অসংখ্য প্রায় নগ্ন মানুষ। শুরু হয় হুড়োহুড়ি। হাতে পেয়েই নিস্তার নেই, একসঙ্গে যুঝতে হবে অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে, সৌভাগ্যের আশায় সবাই চেষ্টা করছেন লাঠিটি কেড়ে নেওয়ার।প্রাচীন জাপানিরা বিশ্বাস করতেন, যে ওই লাঠি শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্গে রাখতে পারবেন, তাঁর ক্ষেত শস্যে ভরে যাবে। যন্ত্রণা ভুলতে অনেকে নেশা করে যোগ দিতে আসতেন উৎসবে। এখন অবশ্য নেশা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন আর আগের মত শস্যের সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ উৎসাহী নন। এবারেই এক যুবক হাতে লাঠি পেয়ে একগাল হেসে বলেছেন, ঈশ্বর উপহার পাঠিয়েছেন, এবার নিশ্চয়ই গোলগাল, সুস্থসবল বাচ্চা হবে। ছায়াদেবী কখন ছায়ার মায়ায় মিলিয়ে গেছেন লক্ষ করিনি।

শান্তির জল ছিটাবার জন্য মঙ্গলঘটে জল ভরে শিখাদেবীকে দিয়ে, আমি সাঁতার কাটতে থাকি। আবাসিকদের এবার শীত লাগছিল, যে যার ডেরায় ঢুকে পড়েছে। ছায়াদেবী জানলা দিয়ে আমাকে চিৎকার করে বলছেন ঠান্ডায় জলে কেন। উঠে পড়ুন অসুখ হবে। উনার হাড়হিম আর্তনাদে বুঝতে পারলাম ঐই ঠান্ডা জলের কোনো ইতিহাস আছে। আমাকে জানতেই হবে, দেরি করলে এই মানসিক অবস্থান পাল্টে যাবে। আমি সিধে উনার ঘরে ঢুকে নাড়ুগোপালের মূর্তি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, কাউকে বলবোনা। আপনি আমাকে বলে মন হালকা করুণ। উনি কিছুতেই বলবেননা। আমিও নাছোড়বান্দা। মুখ খুললেন।

ততখন ক্লাস টুয়েলভে পড়ি। আমাদের স্কুলে সরস্বতী ঠাকুর দেখতে এসে অর্নিবান আমাকে ইশারায় বুঝিয়ে দেয় আমার সঙ্গে প্রেম করবে। আমার খুব রাগ হয়। শুনেছিলাম কোনো এক সিনেমায় নায়িকা তার প্রেমার্থীকে বলেছিল, শীতের রাতে সারারাত পুকুরের ঠান্ডা জলে ডুবে থাকলে প্রেমিকা হবে। আমরা থাকতাম বালি দুর্গাপুরের সমবায় পল্লীতে। পল্লীর মাঝখানে ডিম্বাকৃতি এক ঝিল। ঝিলের চারধারে বসতি। অনেক ঘাট, অনেকের বাড়ির নিজস্ব ঘাট আছে। সরস্বতী পুজো ওই ঝিলের জলের উপর হয়। লাইট দিয়ে সাজানো হয়। সে এক অপরুপ দৃশ্য। হরিদ্বারের হরকিপৌরির থেকেও সুন্দর। মজা করে অর্নিবানকে ফিশফিশ করে বলি সারারাত আমাদের ঘাটের সরস্বতী ঠাকুরের কাছে ডুবে থাকলে আমাকে পাবে।

রাত একটা,আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যাই। ইশারায় বলতে থাকি উঠে যাও, বাড়ি যাও। মা বলে এত রাতে জানলায় কেন, শুয়ে পড়। পরদিন শুনতে পাই অর্নিবানের নিউনিমোয়া হয়েছে। ব্যান্ড বাজিয়ে বিসর্জনে বেরুবে। খবর আসলো অর্নিবান মারা গেছে। কাউকেই কিছু বলতে পারিনি, সারাজীবন চুপচাপ হয়ে গুমরে মরেছি, আমি প্রেমের লোভ দেখিয়ে হিমায়িত করে খুন করেছি।

সোনা ময়রার প্রতিষ্ঠিত দোকান

রাঃ- স্বাঃ

৮৭৬৮৩০২৪৯৬
৮৯০০৫৭০০০১
ফোন- (০৩২১৩) ২৫৯-৩৬৫

জয়গুরু মিষ্টান্ন ভান্ডার

প্রোঃ- সুশান্ত কুমার নন্দী

প্রসিদ্ধ দই ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহক।
এছাড়াও পনির, বাটার, কোল্ডড্রিংক্স ও জন্মদিনের কেক পাওয়া যায়।
খানপুর (হাটতলা,চৌমাথা), হুগলী।

কাদম্বরীর ভূত

মিঠুন মুখার্জী

অনেক দিন আগেকার কথা। তখন আমি বি.এ দ্বিতীয় বর্ষের বাংলা অনার্সের ছাত্র। আমার কলেজের বাংলা বিভাগ থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে আমি, হীরক, শ্বেতা ও শর্মিষ্ঠা সুযোগ পেয়েছিলাম। বাড়িতে কোনো ভাবে ম্যানেজ করে প্রথম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু একটি ভয়ানক অভিজ্ঞতা আমার জন্য সেখানে যে অপেক্ষা করছে তা আমি বুঝতে পারি নি। দিনটি ছিল বুধবার। কথায় বলে 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছে তথা যা।' সকাল বারটার সময় আমাদের বাস জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গেটের সামনে থেমেছিল। আমি ছিলাম কবি গুরুর ভক্ত। তাই আমার কাছে ঠাকুর বাড়ি ছিল আকর্ষনীয় জায়গা। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার রহস্য আজও উন্মোচিত হয় নি। আমি শুনেছিলাম তার আত্মহত্যার ঘরটি তার মৃত্যুর পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারোকে ওই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ওই ঘরটি দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। হীরক আমায় বলেছিল -'' কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা করা ঘরের সামনে একা কখনো যাবি না। আমি শুনেছি তার আত্মার সদগতি এখনো নাকি হয় নি। মাঝে মাঝেই তার ঘরের চেয়ার - টেবিল অনেকেই নড়ে উঠতে দেখেছেন। একটি নারীর ছায়ামূর্তিও কেউ কেউ দেখেছে বলে শুনেছি। তোর অতিরিক্ত আগ্রহের কারনে এই কথাগুলো বললাম।'' হীরকের কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় নি। আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তাই ওর কথায় আমি তেমন কান দিই নি। আমার মন বলেছে -'' আজ থেকে একশো বছর আগেকার একটি আত্মহত্যার ঘটনার কোনো ভৌতিক ব্যাপার-স্যাপার এখনো থাকতে পারে! কেউ না কেউ কাদম্বরীর আত্মার সদগতির জন্য অবশ্যই নিয়ম-রীতি পালন করেছেন।''

কিছুক্ষণ পর শ্বেতা ও তৃতীয় বর্ষের একজন দিদি মিউজিয়াম দেখার জন্য টিকিট কাটতে যায়। সঙ্গে ছিলেন আমাদের বাংলা অনার্সের শিক্ষক প্রবীন সিকদার মহাশয়। টিকিট দেখিয়ে ব্যাগ ও জুতো খুলে আমরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মিউজিয়ামে প্রবেশ করেছিলাম। পুরো বাড়িটা অনেকটা এড়িয়া নিয়ে। যে যার মতো ঘুরে ঘুরে দেখেছিল। আমি কখন হীরক, শ্বেতা ও শর্মিষ্ঠার থেকে আলাদা হয়ে যাই, তা বুঝতে পারি না। চারিদিকে এত বড় বড় ক্যানভাস যা আমি আগে কখনো দেখিনি। সকলেই কাছে দূরে আছে নিজের মতো করে। কেউ ছবি দেখছে, কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখছে, কেউ বিখ্যাত উক্তিগুলো খাতার মধ্যে তুলছে। ঠাকুরবাড়ির সব জায়গায় যে লোকে লোকারণ্য তা কিন্তু নয়। কোনো কোনো জায়গায় খুবই নির্জন পরিবেশ। একটা ভৌতিক পরিবেশ আমি অনুভব করলাম একটা জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কয়েক ডজন পেন, দোয়াত, পুঁথি, টেবিল, চেয়ার, খাট , চশমা, পোশাক, খাবার বাসন সবকিছুই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আমি। তারপর একটা হলঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হই। তখন ওই ঘরে কেউ ছিলেন না। আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখেছিলাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরাট ক্যানভাস। তার নীচে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। এরপর ঘরের চারপাশ দিয়ে ঠাকুর বাড়ির সব উজ্জ্বল নক্ষত্রের ক্যানভাস লাগানো ছিল। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও ছিল।

এরপর ওই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আরেকটি বিশাল ঘরে প্রবেশ করি। সেখানে কয়েকজন লোক ছিলেন। শর্মিষ্ঠা ও হীরকের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। হীরক চুপিচুপি আমাকে আবার একা একা ঘুরতে বারণ করে। ওই ঘরের পাশেই একটি ঘর তালা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। হীরক আমায় বলেছিল এই সেই ঘর যে ঘরে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছিলেন। ঘরটির একটা জানলা খোলা ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে সেই জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ভিতরে কাদম্বরী দেবীর একটি ফটো ঝুলছে। দেখে বুঝতে পারলাম ছবিটি অনেক পুরনো। ঘরটি প্রায় অন্ধকার ছিল। একটি ছোটো লাইট জ্বলছিল। হঠাৎ আমি একটি ছায়ামূর্তি লক্ষ করলাম,যে ঘরের একপাশ থেকে অন্য পাশে চলে গেল। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে যাই। আমি ছুটে হীরকের কাছে চলে যাই। ওকে শর্মিষ্ঠা ও শ্বেতার সামনে একমুহূর্ত আগে ঘটা বিষয়টি আমি জানাই। হীরক আমায় বলে-''এবার আমার কথা বিশ্বাস হলো তো। আমি এই ঠাকুরবাড়ি প্রসঙ্গে গুগলে পড়েছি। তাই তোকে সাবধান করেছিলাম।'' হীরক লক্ষ করে আমি ভয়ে কাঁপছি ও আমার সারা শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তারপর আমরা তাড়াতাড়ি সেই ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে যাই। জোড়াসাঁকোর ক্যান্টিন থেকে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নেব বলে ঠিক ছিল। তবে একবার মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গেলে পুনরায় টিকিট না কেটে ঢুকতে দেয় না বলে জানান প্রবীন সিকদার মহাশয়। আমরা ঠিক করি সমস্ত কিছু দেখে তারপর আমরা মিউজিয়াম থেকে বাইরে বেরব। যদি ক্যান্টিন খোলা থাকে তবে ভালো, নতুবা বাসে ওঠার আগে কোনো হোটেল থেকে আমরা সবাই খেয়ে নেব।

দুপুর আড়াইটার সময় আমরা মিউজিয়াম থেকে সকলে বাইরে বেরই। জোড়াসাঁকোর ক্যান্টিন তখন খোলা ছিল। চাউমিন, এগরোল, মোঘলাই ও চিকেন বিরিয়ানি তখন ছিল। যার যেটা পছন্দ খেয়ে আমরা সকলে একটু বিশ্রাম নিই। এরপর জোড়াসাঁকোর বুক স্টল থেকে কয়েকটি বই কিনব ভেবেছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি খুব দৌড়াচ্ছি। ঠাকুরবাড়িতে একটিও জনপ্রাণী নেই। আমাকে তাড়া করে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছে কাদম্বরীর আত্মা। আমি খুবই ভীতসন্ত্রস্ত। আমি লুকিয়ে পড়লেও সে আমায় খোঁজার চেষ্টা করছে। বলছে -''আমার আত্মহত্যার অনেক কারন তোরা এই একশো বছরে বের করেছিস। কেউ বলেছিস রবির বিয়ের জন্য আমি আত্মহত্যা করেছি, কেউ বলেছিস আমার স্বামীর সঙ্গে সাংসারিক অশান্তির জন্য আমি মৃত্যুর পথ বেঁচেছি, আবার কেউ বলেছে রবির সঙ্গে আমার বিবাদ হয়েছিল। কোনোটাই ঠিক নয়। সব কিছু পাওয়ার পরও কখনো কখনো মানুষের জীবনে একরাশ শূন্যতা থাকে। তাছাড়া বাইরে থেকে দেখে মানুষের জীবন সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে তা প্রকৃত সত্য নাও হতে পারে। যে পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি সেখানে সমস্যাও অনেক বেশি। একজনের গ্রহনযোগ্যতা সকলের কাছে সমান হতে পারে না। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, একমাত্র পরিস্থিতি দায়ী। '' এরপর রাগে কাদম্বরীর আত্মার দুচোখ দিয়ে আমি আগুন বেরতে দেখলাম। সেই আগুনে ঠাকুর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সেই আগুনে আমিও পুড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ আমি চিৎকার করে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে উঠি। ভয়েতে সারা শরীর ঘেমে যায়। আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে যারা ছিলেন তারা সকলে ভয় পেয়ে যান। কয়েক মুহূর্ত পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলি-'' কিছু না, স্বপ্ন দেখছিলাম । কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই তা বুঝতে পারি নি।'' আমায় দেখে হীরক বুঝেছিল নিশ্চয় আমি কাদম্বরীর আত্মাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। সে আমার দিকে তাকিয়ে হালকা হেসেছিল।

মিনিট পনেরো পর আমরা সকলে নিজের নিজের পছন্দের বই কিনে বাসে উঠি। বাড়ি ফেরার সমস্ত পথ কাদম্বরীর আত্মা আমার মস্তিস্ক ঘিরে ছিল। বারংবার তার দুচোখ থেকে আগুন বেরনোর ভয়ঙ্কর মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমার মনে হয়েছিল -'' কাদম্বরীর আত্মার বলা প্রতিটি কথাই ঠিক। এ জীবনে আমরা সব পেলেও মানসিক শান্তি যে থাকবেই তা কিন্তু নয়। জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল একাকিত্ববোধ ও একরাশ শূন্যতা। যা অন্যে একেবারে বোঝে না। সকলে মনে করে বাড়ি - গাড়ি - অর্থ - যশ থাকলেই সে সুখী। প্রকৃত সুখের অর্থ আজ কেউ বোঝে না।'' জোড়াসাঁকো থেকে বাড়ি ফিরে কাদম্বরীর আত্মা আমার মন থেকে বিলীন হতে অনেক সময় লেগেছিল।

চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচীগুলি নিম্নলিখিতভাবে রূপায়ন করা আমাদের লক্ষ্য।

১। আই এস জি পি আগামীদিনে আরও উন্নততর গ্রাম পঞ্চায়েত গড়াই আমাদের লক্ষ্য।
২। সামাজিক বনসৃজনে আগামীদিনে ব্লক ও জেলায় প্রথম সারিতে থাকা আমাদের লক্ষ্য।
৩। সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শৌচাগার, কন্যাশ্রী, পেনশন সমূহ আইসিডিএস ও এসএসকে গৃহ নির্মাণ, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি রূপায়নে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।
৪। মহিলা স্ব-সহায়ক দলগুলিকে উপসংঘ ও সংঘ গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা আমাদের লক্ষ্য।
৫। এলাকায় দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে এবং সেই সাথে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান আমাদের লক্ষ্য।
৬। এলাকার কুষ্ঠ ও টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান।
৭। এলাকাকে নির্মল করে তোলা পঞ্চায়েতের লক্ষ্য।
৮। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।
৯। লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

পার্থ প্রতীম শেঠ
উপ প্রধান

অসীমা বাগ
প্রধান

অমলের বন্ধু

পার্থপ্রতিম গোস্বামী

অনেকদিন ধরে খুঁজছিল সে। খুঁজছিল আলো। যা হঠাৎ চমক দিয়ে ওঠে, আর মিলিয়ে যায়। কারণ, ধরা দেওয়ায় তার বিষম আপত্তি। ধরা সে পড়তে চায় না। ছুঁয়ে দিলেই নিভে যায়, গুটিয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে, অনেকটা লজ্জাবতী লতার মতো।

সেও তো তাই। তাকে দেখলেও ঠিক দেখা যায় না। চোখের সামনে দিয়ে সে ভেসে যায়, তবু চোখে পড়ে না। তবে আলো তার ভেতরেও আছে। খুব মন দিয়ে তার চোখের দিকে তাকালে সেখানে একটা টলটলে দিঘী দেখতে পাবেই। গাছে ঘেরা। জলে রোদ্দুরের ভালোবাসা ঝিকমিক করছে। চারিদিকে ছড়ানো ছেটানো ছোটোবড়ো কাঁকুরে টিলা। আর সামান্য দূরেই শালের জঙ্গল। সেখানে চুপচাপ বসে আছে সে, যেমন প্রায় রোজই বসে থাকে, কখনও সশরীরে, কখনও মনে মনে। আর গান গায় গুন গুন, পাতার মর্মরের সাথে মিশিয়ে দেয় সুর। পাখিরাও এসে যোগ দেয়। গানের খেলা চলতে থাকে, সুর পাল্টায়, পাতার ফাঁকে রোদের কমা বাড়ার সাথে তাল মিলিয়ে।

তবু সে খুঁজছিল আলো। একেবারে অন্যরকম। যেন ঝাড়বাতি। বাসন্তী রঙের আলোর ঝালর হয়ে ঝুলছে গাছের ডালে ডালে। অমলতাস। কী সুন্দর নাম! কেন যে এত ভালো লাগে তাকে! সে কি অন্য কাউকে মনে পড়িয়ে দেয়? বা, কোনো বাসন্তী রঙের বিকেলের কথা? বিকেল, নাকি শাড়ি, না ওড়না? আচ্ছা, বিষাদের রঙ কি বাসন্তী হতে পারে? নাকি এসব কিছুই নয়, এ তার মনের রঙ। বা সে নিজেই এই গাছ, যে এই ফুলের মতোই অসাধারণ কিছু করতে চায় যা মনকে আলোয় ভরে দেয়। উচ্চকিতভাবে নয়, একান্তে, নিরালায়, বাঁশীর সুরের মতো, আবডাল থেকে বেজেই চলে, আর কী আনন্দ ভেসে বেড়ায়, মোচড় দেয়, জাপটে ধরে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলোকে, কী মোক্ষম, আর কী অনায়াসে! অথচ যখন ফুল থাকে না, আলাদা করে চেনাই যায় না তাকে। এমনিতেই খুব কম মানুষই তাকে চেনে, নাম জানে তার, এতই সংখ্যাই কম সে, আর এতই অল্প তার ফুলের আয়ু। তবু সে খুঁজছিল তাকেই। এমন আলোর জন্ম দিতে পারে যে গাছ, তা যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন, তা তার কাছে অমূল্য। শুধু প্রয়োজনই কি সব, দরকার, চাওয়া-পাওয়ার বাইরে কি কিছু থাকতে নেই?

এবং অবশেষে পেয়ে গেল। আর আশ্চর্য, একেবারে রাস্তার ধারেই, তার যাতায়াতের পথে। ফুল আসতে কি দেরী করেছিল ! অথবা তাকে যে দেখতে পাবে তেমনটা আশাই করে নি সে,তাও এমন জায়গায়। তাই হয়তো। চোখে যখন পড়লো তখনও যে খুব বেশি ফুটেছিল এমন নয়। পাতার ফাঁকে সামান্য পরশ। তবে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল তার চোখে পড়ার জন্য। যেমন খুব প্রিয় কেউ যার বহুদূর থেকে একটা অল্প আভাসেও তুমি সহজেই নিশ্চিতভাবে তাকে চিনে নিতে পারো। আজ না হয় সামান্য, তবু একদিন তো আসবেই যেদিন গোটা গাছ ভরে উঠবে অপার্থিব আলোয়। এ যেন মনে মনে দেখতে পায় সে, আর মনে মনেই আনন্দে অস্থির হয়ে ওঠে। যাইহোক, দেখতে যখন পেলই, তার মালিকের সাথে দেখা না করলেই নয়। একটা বড়সড় ধন্যবাদ তার প্রাপ্য। অবশ্যই তাকে বুঝতে না দিয়ে। সবাই তো এমন বিশুদ্ধ আবেগের মর্ম বোঝে না, পাগলামি মনে করতে পারে।

ঐ তো মাটির ঘর, চালে খড়ের ছাউনি, সামনের সামান্য উঠোন, ওখানেই তো বসে আছে একজন। তার আশেপাশে পোষা মুরগী ছানা, আর কয়েকটা ছোটোবড়ো ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেমন অস্পষ্টভাবে সে চেয়ে আছে তাদের দিকে। হিসেব করছে কি, ঠিক কতদিন পরে, আর কতটা অর্থকরী হয়ে উঠতে পারে ওরা? নাকি মায়া আর জাগতিক প্রয়োজনের মাঝখানে দিগভ্রান্ত পথিকের মতো এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় আছন্ন হয়ে দূরের কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি ? বা, মধ্যাহ্নভোজনে উদরের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পান্তা খেয়ে চোখকে আর কোনোমতেই বাগে রাখতে পারছিল না সে? আর যাইহোক, উন্নয়নের জোয়ারে চালের অভাব নেই

ঘরে।

এই যে দাদা, শুনছেন?

হঠাৎ ডাকে চমকে উঠলো লোকটা। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগলো তার। তারপর সামলে নিয়েই তাকালো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

আচ্ছা, এই গাছটা কি আপনার?

হ্যাঁ, কেন?

না, না, এমনিই। মনে মনে একটু হেসে নেয় সে। লোকটা জানেই না, কারুর জায়গায় গাছটা থাকা মানেই সেটা তার হতে পারে না। এ গাছ তো আসলে তার যে এত দিনের আকুল অনুসন্ধানের পর এটাকে আবিষ্কার করেছে। সে বরং একটু ভাগ দিতে পারে যদি ও গাছটার নাম বলতে পারে। দেখা যাক্।

আচ্ছা, এই গাছটার নাম কি?

তার মুখ দেখে মনে হল, পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত প্রশ্নটি করা হয়েছে তাকে। সে খানিক ভেবে বললো, তা তো জানি না, বাবু। তবে লম্বা, লম্বা ফল হয় দেখেছি বাঁদরের লেজের মতো। আর এগুলো থেকে নাকি কি সব ওষুধ তৈরী হয়, বলছিল একজন।

লোকটার উত্তর শুনে ভীষণ রাগ ধরে গেল তার। আশ্চর্য তো! ফুলের কথা বললোই না। যেন ওটা কোনো কাজের কথাই নয়। না, না, গাছটা একটুও দেবে না ওকে। অবশ্য তাতে যে খুব একটা কিছু যাবে আসবে ওর, এমনটাও মনে হল না। কারণ আর যাইহোক, সুদূর ভবিষ্যতেও এর ফলগুলি থেকে ওষুধ বানাবার কারিগরি শেখার সম্ভাবনা নেই তার।

যাইহোক, আজ সে খুব খুশী আর নিশ্চিন্ত। যাকে সে এতদিন ধরে খুঁজেছে, মনেপ্রাণে চেয়েছে তারও কাছাকাছি, নাগালের মধ্যে সে থাকুক, তার সেই আন্তরিক কামনা আজ সার্থক হয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে এই গাছ দুর্লভ নয়। কোনো কোনো জায়গায় প্রচুর আছে। তবু তাকে নিজের করে চাইতো সে সবসময়। কাছাকাছি, ইচ্ছে হলেই যাকে ছোঁয়া যায়, চোখ মেলানো যায়, ছায়ায় জড়িয়ে থাকা যায়।

এরপর দেখা হতে থাকল প্রতিদিন। আর তারপর দীর্ঘ বিরতি। নেমে এসেছে অভূতপূর্ব দুর্বিপাক। সেই ভয়ানক অতিমারী। আতঙ্কে সকলে বসে রইল দমবন্ধ ঘরের সিন্দুকে। পথ ভুলে গেল পথচলা। সে নিশ্চয়ই ভোলে নি ফুল ফোটানো। তার কি খুব অভিমান হয়েছিল, সে গিয়ে একবার মাখলো না সেই আলো? সে অপেক্ষা করে আছে, এটা জানা সত্ত্বেও এল না একটিবার? নিশ্চয়ই হয়েছিল। মনে মনে গুমরে মরছিল সে। আর তাই, যখন সেই অতিমারীর মধ্যেই ধেয়ে এল আর এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়, সে একা সহ্য করতে পারল না সেই নিদারুণ অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা। গোড়ার একটু ওপর থেকে মুচড়ে ভেঙে পড়লো তীব্র যন্ত্রণা আর হতাশায়।

আর অন্যদিকে ঘরে বসে বসে সে কি সত্যিই ভুলে গিয়েছিল তাকে? মনে পড়ে নি একবারও, মনখারাপ করে নি তার জন্য ? তাও কি সম্ভব! একেবারেই না, বরং দেখা না হলেও, এই কাছাকাছি থাকাটা খুব বড়ো ভরসা হয়ে ছিল তার কাছে। শুধু বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় জানাতে পারে নি তাকে। বা দেখা হতো যখন এসব জরুরী তথ্য জানানোর কথা মনেই থাকতো না তার। তার বদলে কেবল অপলক চেয়ে থাকা, আর অনুভবে রেঙে ওঠা। তাহলে কি হবে এবার, যখন সে জানবে সব! সেও কি মুচড়ে ভেঙে পড়বে গভীরে? আবার উঠবে? আবার শুরু করবে খোঁজ? নাকি গভীরেই রেখে দেবে তাকে? সেখানেই হবে নিভৃত কথোপকথন। রাখতে জানলে সবসময় সবকিছু বাইরে খোঁজার দরকার হয় কি?

তুমি কি বলো অমলতাস? আচ্ছা, তোমার সেই বন্ধুর নামও তো অমল, তাই না? তাহলে তো এ গল্পের কোনো শেষ নেই। শুধু বাতাসের কানে কানে গুনগুন মিশিয়ে দেওয়া, ''অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া / দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমনি তরনী বাওয়া।''

পাঁঠাবলি

রঞ্জন কুমার ব্যানার্জী

কালীপুজোর রাত । পাঁচিল টপকে চারপাশটা দেখে নিল বিশে। দত্তবাড়ির সবাই পুজোয় ব্যস্ত। কাজ হাসিল করতে হবে এখনই। ঝুঁকিটা একটু বেশিই নিয়ে ফেলেছে বিশে ওরফে বিশ্বজিৎ মাজী। বাড়িটা যে দত্তবাড়ি। এই নামে যে অনেক বাঘ-গোরু একঘাটে জল খায়। প্রতাপ দত্ত শুধু পঞ্চায়েতের প্রধান-ই নয়, এম.এল.এ.-র সাথেও তার ওঠাবসা।

বিশে জানে যে কাজ ও আজ করতে এসেছে, তার বিপদটা কতখানি। যদি একবার ধরা পড়ে, প্রথমে গাঁয়ের সালিশি সভায় ওর হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে দেবে, তারপর একঘরে করে দেবে ওদের প্রতাপ দত্ত। তবু একাজ করতেই হবে ওকে, জেদ চেপে গেছে বিশের। আজকের পর থেকে দত্তবাড়িতে পাঁঠাবলি বন্ধ।

একবার দুচোখ বন্ধ করতেই ওর সামনে ভেসে এল গতবছরের সেই হিংস্র স্মৃতি। একটা নিরীহ প্রানীকে ঘিরে বাজনা বেজেই চলেছে, তাকে পুকুরে স্নান করানো হল, কপালে সিঁদুর লেপে দেওয়া হল।বিশালাকৃতি কাঠের হাড়িকাঠে গলাটা চেপে ধরার আগে পর্যন্ত ঐ অবলা প্রানীটা বুঝতেই পারেনি তাকে ঘিরে এত 'জামাই আদর' কেন। দুটো পালোয়ান গোছের লোক ভাড়া করে আনা হয়েছিল। তাদেরই একজন পাঁঠার গলাটা হাড়িকাঠের মধ্যে চেপে ধরে ওপরে সমান্তরাল দুই গর্তের ভিতর দিয়ে কাঠের কাঠিটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যাতে ও আর নড়াচড়া করতে না পারে। আর একজন মাথাটা টিপে ধরে রেখেছিল মাটিতে। প্রাণভয়ে দুচোখে আকুতি নিয়ে নিরীহ প্রানীটা যত চিৎকার করার চেষ্টা করছিল, ততই তীব্রতর হচ্ছিল ঢাকের আওয়াজ আর পুরোহিতের 'মা', 'মা' আর্তনাদ। গোটা গাঁয়ের কয়েক'শ লোক জড়ো হয়েছিল মন্দিরের চাতালে। পুরোহিতের নির্দেশের সাথে সাথেই সিঁদুর মাখানো খড়্গের এক কোপে দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করেছিল ঐ দৈত্যের মত দেখতে লোকটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে গোটা চাতালটা রক্তিম করে দিয়েছিল। চারটে পা চারপাঁচবার ছটফট করে স্থির হয়ে গিয়েছিল। যেন বলতে চেয়েছিল-'আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। তোমরা আমায় বাঁচতে দিলে না কেন?' পুরোহিত কাটা মুন্ডি থেকে দু-ফোঁটা রক্ত নিয়ে ঠেকিয়েছিল মায়ের জিভে। গ্রামবাসীরা সবাই যখন জোড়হাত করে ঐ মুহূর্তে মা-কে স্মরণ করছিল, তাকিয়েছিল মায়ের দুচোখের দিকে, সেই মুহূর্তে আয়তনয়না, এলোকেশী মাকে বড্ড নিষ্ঠুর, নির্মম মনে হয়েছিল বিশের।

বাড়ি গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাকে সব বলেছিল। মা বোঝাতে চেয়েছিলেন 'ওরে পাগল, ওটা মৃত্যু নয়, মুক্তি। পাঁঠারা মায়ের পায়ে ঠাঁই পেলে মুক্তি পায়'। মানেনি বিশে। তাই একবছর বাদে আজ এসেছে 'প্রতিশোধ' নিতে। শুনেছিল প্রতাপ দত্ত তিনটে গ্রামে কোথাও কালো পাঁঠা পায়নি। বলিতে পুরো কালো না হলে যে 'খুঁত' হয়ে যাবে। তাই পাক্কা ষোলো হাজার টাকা খরচ করে এগার মাইল দূর থেকে পাঁঠা কিনে আনিয়েছে। মাকে গয়না পড়ানো, ঘটে জল ভরা, পুজোপাঠ সব মিটে যাবার পর পাঁঠাবলি হতে হতে মাঝরাত। ততক্ষণ পাঁঠা বাঁধা আছে মন্দিরের গায়ে চালাঘরে। বিশে দিনের বেলা বার চারেক এসে ঘুরে গেছে জায়গাটা। ঢাকি পাহাড়া দিচ্ছিল সারাদিন। এখন ও বাজাতে গেছে। কিছুটা অন্ধকার এই বাগানের দিকটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এখান দিয়েই পাঁঠাটাকে টপকে দিয়ে ও নিয়ে পালাবে।পাঁঠা না পেলেই বন্ধ হবে বলি।

চারিদিক ভালো করে দেখে পা টিপে টিপে পাঁঠার দিকে এগোচ্ছিল বিশে। না, আজ আর ও ভয় পাবে না; ভয় যে বিপদকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সন্তর্পণে পাঁঠার দড়িতে হাত দিতেই পিছনে এক কালো ছায়া। চমকে উঠল ও। এক ঠান্ডা স্রোত শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে গিয়েছিল। পিছনে দাঁড়িয়ে শ্যামলবাবু, প্রতাপের অবিবাহিত কাকা।

--কেরে, কী করছিস এখানে অন্ধকারে?

–কেউনা গো দাদু, আমি বিশে। পাঁঠাটাকে দেখতে এসেছি।

--যা, ঠাকুরতলায় যা।

যতই আলোর দিকে এগোচ্ছিল বিশে, অন্ধকার ততই গিলে খেতে আসছিল ওকে।

ভুত দেখা

কল্যাণ সেনগুপ্ত

''আপনি ভুত দেখেছেন?''

''ওরে দেখেছি,দেখেছি।ঠিক যেমন তোকে দেখছি।''

''আপনি ভুতের সঙ্গে কথা বলেছেন?''

''বলেছি তো। রোজ বলি যেমন এই তোর সাথে বলছি।''

''আমাকে দেখাতে পারেন?''

''হ্যা। এ আর বেশি কথা কি?''

''কী কথা বলেন? ''

''ওরে রোজ যেমন ভালোমন্দ ,সুখ দুখ সব কথাই আমরা বলি। ভুত বলে কি মানুষ নয়? তোরা তো ভুত বলতে মানুষেরই ভাবিস। আর কি ভুত নেই? ''

''আরো ভুত আছে? ''

''হ্যা ,কাতারে কাতারে আছে। গিজগিজ করছে চারিপাশে আছে।শুধু দেখতে পাচ্ছিস না। ''

''বলেন কি? ''

''আসলে দেখতে চাইছি না। ওই তো গন্ডগোল, শুধু মানুষ মরেই কি ভুত হয়? তাহলে বাকি লক্ষ কোটি যে প্রাণী মারা যাচ্ছে তারা মরে কি হচ্ছে? এই যে শহরে এত এত গরু, বাছুর, কুকুর বিড়াল মারা যাচ্ছে তাদেরও তো ভুত হবার কথা ,কারণ পারলৌকিক কাজ তো তাদের হয় না। বল ঠিক কিনা? এইতো সেদিন রাত্রে বাইরে বাথরুম করতে গিয়ে মিনির সঙ্গে দেখা।''

''কে ? তোমার প্রেমিকা?''

''তাও বলতে পারিস। বড্ড ভালবাসতাম। কী দেখতে, একদম বইয়ের থেকে উঠে আসা। রোজ আমার সাথে পায়ের তলায় শোয়া চাই। হুস করে একদিন চলে গেছিল। বাথরুমে যেতে দেখা। কিছুক্ষন দেখল তারপর গা ঘষল। একটু মুচকি হেসে পাঁচিল উঠে মিলিয়ে গেল।''

''বল কি?''

''হ্যাঁ, তাছাড়া শুধু মরলেই কি ভুত হয়? না মরে ও কি ভুত হয় না?''

''তোর ঠাকুরদা একানব্বই বছরে যে বছর ভর বিছানায় পড়ে ছিল ,জ্ঞান ছিল না। তখন কিছুদিন চলে যাবার পর কতজন খোঁজ নিয়েছে? বিছানায় মিশে যাওয়া একটা শরীর । ওটা কি? ''

''মন্দ বলেন নি।''

''মরে ভূত হওয়া ঢের ভালো। সে ভূতের আবার অন্য দুঃখ''।

''তাদের আপনি দেখেছেন?''

''দেখেছি মানে? আমার তো রাস্তা ঘাটে ওদের বাঁচিয়ে যেতে যেতেই অনেক সময় চলে যায়।ক্ষ্ম

ক্ষ্মকই আমি তো দেখিনি? আমার সাথে কই ধাক্কা লাগেনি?''

''লেগেছে। যখন তখন ধাক্কা লাগছে, দলে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস। ওরা যে ভুত হতে পারে এ কথাই তো তোরা বিশ্বাস করিস না।''

''মনে হয় ঠিকই বলেছেন? কী কথা বলেন সেটা বলেন নি তো।''

''এই যেমন প্রায়ই কিছু ভূতেদের সঙ্গে বটগাছের নিচে বসে কথা বলি। ওদের কষ্টের কথা শুনি। কতদিন ভালো করে খেতে পায়নি। পেটে কিল মেরে পড়ে থাকে। থাকার জায়গা নেই, শোয়ার বিছানা নেই। দলে দলে লাইন দিয়ে দাড়িয়ে নানা খালি জায়গায়। আমরা ধরে নিয়েছি ওরা ভালো আছে। খেতে পায়না, পড়তে পায়না, আকাশের নিচে থাকে। শহরে তো একমাত্র পার্ক ই জায়গা। এক টুকরো মাংস নেই গালে। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। বুকের পাঁজর গুলো দেখা যাচ্ছে। সমস্ত মাঠগুলো লাইন দিয়ে দাড়িয়ে। সব বড় লোক ছোটলোক সবাই লাইনে কিছু সামান্য অনুদান পাবার আশায়। প্রথমে ওদের ভিখিরি পরে ভুত বানানো হয়েছে। কিন্তু বলা হয়েছে ওরা ভালো আছে ।

এরা রোজকার ভুত। এর সাথে ভুত চতুর্দশী তে যোগ হবে কয়েক যুগের দাদু ঠাকুমারা। এরা একদিনের জন্যে দেখতে আসে আমাদের এবং নিজেদের কেও। দেখে হা হুতাশ করেন কেমন

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন কেমন তার উত্তরাধিকার বেঁচে মরে আছে।''

''আপনি কি সব বলে চলেছেন ।মাথাটা গেছে নাকি?''

''গেলে ভালো হোত। ভুত দেখতে পাওয়া খুব কষ্টের। না দেখলেই ভালো। ওরে তুই কি মনে করিস আমরা মানুষ হয়ে বেঁচে আছি?''

''এই দেখো নোধোদা আপনার রাত্রি হলে পেটে রঙিন জল পড়লেই সব গুবলেট। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দেন।''

''ওরা দলে দলে আছে অথচ দেখতে পাচ্ছি না। যাতে না দেখতে পাই তাই চেষ্টা করছে সবাই।''

''কেন এমন চেষ্টা?''

''ওই যে ভয় পেয়ে যাবে। ভয় পাওয়া টা খুব খারাপ। ভয় পেলে আজকের অনুগত ভূতেরা চেপে ধরে। ভয় পেলে মন ছোট হয়ে যায়। ওদের দলে টেনে নেয়। ওরা আবার চার পায়ে হাঁটে''।

''কেন? চার পায়ে হাঁটে? ওরা দাড়াতে পারে না?''

''কী বোকা রে তুই। ওদের তো মেরুদন্ড ই নেই। আগেই খুলে নিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটবে কি করে?''

''ওসব ছাড়ো। আচ্ছা আমার দাদু দিদিমা এলে চিনতে পারব কি করে এই ভিড়ে?''

''পারব নাতো। পারবো না বলেই তো অনেক এজেন্ট রয়েছে ।তারা ঠিক চিনতে পরে। কিংবা চেনে না চেনার ভান করে।তারাই নিয়ে গিয়ে চতুর্দশী র আলোয় আমাদের চিনিয়ে দেয় আমাদের পূর্ব পুরুষদের কে''।

''সোজা কথা বলুন , আমি কি ভুত কে দেখতে পাবো?''

''মন প্রাণ দিয়ে ডাকলে ভগবান চলে আসেন আর ভুত তো কোন ছাড়।''

''ঠিক আছে। ভুত নিয়ে রাত্রি বেলা আপনার সাথে কথা বলা ঠিক হয় নি। আপনার সঙ্গে দিনের বেলা এ নিয়ে কথা বলব''।

''আচ্ছা তাই বলিস। তখন কিন্তু ভূতের গল্প জমে না। আসলে তোরা বলিস গল্প আমি বলি সত্যি। এই বলে বেশ গম্ভীর হয়ে নোধোদা চলে গেল। আজ নোধোদা আর আমি ছাড়া কেউ নেই রোযাকে।

রাস্তায় আলো কম। নোধোদা দার্জিলিং না যাওয়ার দুখ্যে একটু বেশিই খেয়েছে সন্ধ্যে বেলা। ভূতের শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দিল।

বাড়ি ঢুকে বাথরুমে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তেই আবার নোধোদার ফোন। ভাবলাম আবার কি হল?আরো কিছু ভুত নিয়ে বলার বাকি আছে নাকি? নেশাটা আজ খুব চড়েছে।কিন্তু বুকটা ধড়াস করে উঠল গলা শুনে ক্ষ্ম এলি না তো। দারুন মিস করলি। মেঘ মুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা হাসছে দার্জিলিং এর হোটেল বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছি। হাত থেকে ফোন টা পড়ে যাচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছি গলা ''

''কিরে শুনতে পাচ্ছিস? কিরে গলার আওয়াজ দিচ্ছিস না কেন? গলা শুকিয়ে কাঠ। শরীরে যেন কোন শক্তিই নেই। মুখ, ঘাড় ঘেমে উঠেছে। এক দৌড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে নীচে নেমে দেখি রাস্তা খালি।পড়ি কি মরি করে নোধোদার বাড়ি গেলাম। মাসিমা আমাকে ভুত দেখার মত দেখলেন। বললেন '' তুমি? একি তুমি যাওনি? নোধো যে বললে তুমিও যাচ্ছ? শরীর খারাপ নাকি?

মাসিমার কথায় সমস্ত শরীর কাঁপতে লেগেছে থর থর করে।জিভ শুকিয়ে কাঠ।

মাসিমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ''তোমার মুখ টা এমন ফ্যাকাসে লাগছে কেন? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে।

আমার যে কি লাগছে সেটা আমিই জানি।অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম তাহলে কার সঙ্গে এতক্ষন রোয়াকে বসে কথা বলেছিলাম ? রাস্তায় দাড়িয়ে পড়তে হল। শরীরের কাঁপুনি কমছে না। দুটি পা ঠক ঠক করে কাঁপছে এই দুহাজার চব্বিশে।আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি.... ?.....''।

বিপ্লব -একটি পাখির নাম

শাশ্বত বোস

দিনের এই সময়টা, বেশ একটা মধ্যবর্তী ভাব রেখে, চলে যায়, মনের কোণে, এক আখর বিন্যাসী মেঘ জমতে চাওয়া, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যের পূর্বরাগে। জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে, কেমন যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায় ছেলেটার।প্রবল গ্রীষ্মের বহ্নিশিখা, বাইরেটা পুড়িয়ে ঝাপসা করে দিয়েছে একেবারে। চেতলার এই পুরোনো বাড়িটার, মেঝে ছুঁতে চাওয়া, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে, উঁকি মারছে, পিছনের বাগানের মেহগনী গাছটা। গাছে সবে নতুন পাতা আসতে শুরু করেছে। ছেলেটি দেখেছে, প্রতি শীতের কোন এক নির্লিপ্ত কালবেলায়, গাছটার সব পাতা ঝরে যায়। খুব ভোরের চোখ কচলানো দৃষ্টিতে, সে দেখেছে গাছটার ছায়া, ছোট হয় এ সময়। আবার ঠিক পোয়াতি বসন্তে, দখিনা বাতাসে দোল দিয়ে, নতুন প্রাণ আসে গাছটায়। তার পেলভিস নিঃসৃত কামরস বেয়ে, শুরু হয় সারিবদ্ধ পিঁপড়ের আনাগোনা। ছোট্ট চড়াইদুটো, বাসা থেকে বেরোয় ক্রমশ বাড়তে থাকা, মোবাইল টাওয়ারের, বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়াকে দুয়ো দেখিয়ে, গাছটা থেকে আকাশে ঝাঁপ মারে, শতাব্দী শোক ভেঙে উড়ে যায়, নরম জীবনের সন্ধানে। ঠিক যেমন, আজ থেকে বছর তিনেক আগে, ছেলেটা জামবনি থেকে কলকাতায় এসেছিলো, কোন এক বৈরাগী বিকেলের শুরুতে, কোন ভালো নাটকের দলের অংশ হতে সেই শুরুর দিন থেকে, প্রতিটি সন্ধ্যে সে কাটিয়েছে, কল্লোলিনীর শরীরে উত্তাপ ছড়ানো, চায়ের স্টোভের গলনাঙ্কে ফুটতে চেয়ে।সারাদিন রিহার্সালে, নাটকের দলের ব্যস্ত তারকার, প্রক্সি দেবার পর সে ফিরত, এই তেতলার অন্ধকার ছাতের ঘরটায়।দেশ কালের সীমানা ছিড়তে চাওয়া, ঘুলঘুলির ফাঁকে তখন, সহস্রাধিক এঁটো বাসন, আর মেগা সিরিয়ালের শব্দব্যঞ্জনা। ঠিক যখন, জামবনির পাহাড়ঘেরা ধু ধু তিলের ক্ষেতের হাওয়া, এসে লাগে, ঘর লাগোয়া পুরোনো ছাতটায় অন্ধকারের ক্লান্তি পেরিয়ে, ধীর পায়ে, ছাতের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ায় ছেলেটি। বাড়ির পিছনের দৈত্যাকার গাছটাও তখন এক্কেবারে একা।

আজ বিকেলে তার রিহার্সাল ছিল না।বেলাশেষের এই অখন্ড অবসরে, দপ্তরী মোমের মিছিল, আর ধ্রুপদ সাহিত্য স্মৃতি বুকে করে, ছেলেটা আবার ছাদে এসে দাঁড়াল। গাছটাও যেন, চোখের পাতা না পড়া দৃষ্টিতে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ঠিক যেমন জামবনিতে, ওদের বাড়ির পিছনে, বিশাল বটগাছটা চেয়ে থাকত, ফুটিফাঁটা এপ্রিলের দুপুরে দেখতে দেখতে, গাছটার চোখগুলো অল্প আঁচে জ্বলে ওঠে। ঝুড়িগুলো তার গা বেয়ে নেমে এসেছে, যেন সময়ের কোন অদৃশ্য কোণ থেকে, কালসর্প দোষ ধেয়ে আসছে, হিসেবী রাত্রিবানী বুকে করে। জঙ্গলের ভিতর, করাত কল থেকে ভেসে আসছে, সংস্কারী চৈত্রমাসের, গোত্রহীন যান্ত্রিকতার উপনিষদ। ছেলেটার বাবা, ওই করাত কলটায়, দিনে ১০ ঘন্টা খাটতো হয়ত এক ফাঁকে, পাশের ভাতের হোটেলে ঢুকত, টিফিন করতে। মোটা চালের পান্তা ভাত,শাকভাজা, সাথে নুন-লেবু-লঙ্কা। গ্রীষ্ম শুরুর দুপুরবেলায়, সমস্ত জঙ্গল জুড়ে যেন, আগুন লেগে যায়। কচি কলাপাতা রঙের নতুন বৌ, যেন গায়ে হলুদের শাড়িখানা, জড়িয়ে নিয়েছে আপাদমস্তক। অস্বাভাবিক আগুন রঙা, ঢ্যাঙা গাছগুলোর, গোড়ার দিক চওড়া হয় ক্রমশ। লাল মাটির বুকে, স্থায়ী সমাধানের মত, উঁইয়ের ঢিবি, এবরো-খেবড়ো, আকারহীন, যেন বসন্ত আর বিষফোঁড়া মেশানো, কোনো দেহাতী লোকের মুখ, এক্ষুনি সাপের মত জিভ বার করবে, এঁকে বেঁকে।ছেলেটি শুনতে পায়, দূর গাঁয়ের মেয়ে-বৌদের, গোল হয়ে গাওয়া পরবের গান। জঙ্গলের মাঝে একটা প্রাইমারী স্কুল, স্কুলের গা বেয়ে, পাহাড়ের উপর এঁকে বেঁকে উঠে গেছে, পাকা রাস্তা। যেন পৃথিবীর গা বেয়ে, গড়িয়ে যাওয়া, জ্যোতিষ্কের ত্রিদিবী আবেগ।ছেলেটার এখনো মুখে লেগে আছে, এরকম চালচুলোহীন দুপুরে, ভাত দিয়ে মেখে খাওয়া, ওর মায়ের হাতের পোস্তবাটা। আজ এই মুহূর্তে, বিপন্ন বক্ররেখায়, ভিড় করে এসে দাঁড়ায়, ওর শৈশব-কৈশোর-যৌবন। দূরের ওই শহুরে গাছটা যেন, ওকে দেখে, বিশেষ কোনো এক ভঙ্গিমা করতে চায়।এই ভঙ্গিটা ওর চেনা ওদের গাঁয়ে মুখ বেঁধে আসত, এক দল লোক, পিঠে রাইফেল। কোন এক বিবাদী রাতের ভোরে, তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। নিজেদের সাথী করেছিল, ওর নতুন নাম দিয়েছিল 'কমরেড লাখাই'। লোকগুলো রোজ রাত নামলে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামে আসত। কোথাও বাড়ি গিয়ে ভয় দেখাত, কোথাও আবার জনতার দরবারে, চাল ডাল বিলি করত। ওদের কাছে শ্রেণীশত্রু প্রতিপন্ন হলে, তার বিচার ওরা এই জনতার দরবারেই করত। এমনকি আসামীর পরিবারের সামনে, বুলেট পুড়ে দিত, বস্তুবাদী বিপ্লবের শত্রু 'বুর্জোয়া' টির

বিবস্ত্র, ময়াল শরীরটায়। জোড়হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, উপর দিকে ছুড়ে স্লোগান দিত, ''লাল সেলাম''। ছেলেটার, লোকগুলোকে খুব খারাপ লাগত না। কারণ, ওরা এই সমাধিস্থ সমাজের, সরীসৃপ নৈতিকতাকে, লন্ডভন্ড করে দেবার কথা বলত'সমূল' পরিবর্তন, দিনবদলের ডাক, এই মহাজাগতিক দর্শনগুলো, ক্রমশঃ ছেলেটির চোখের সামনে, নধর চাঁদের মত, অর্ধনারীশ্বর রূপ ধরত। লোকগুলো একটা দল করত, বন্দুক আর বুলেট, যার ক্ষমতার সোপানঊ ওদের দলের লিডার, ক্রমশঃ হয়ে উঠছিল, এলাকার স্বঘোষিত 'রাজা'। এমনই কোন এক, ঘুণ ধরা বিকেলে, লিডার মুন্ডু নিয়েছিল, স্থানীয় জোতদার, জমির দালাল,দমাগলা সারেনদ এর। এই মাগলাই, কোনদিন ছেলেটির বাপকে, নিজের পায়ের জুতো খুলে মেরেছিল, নিতান্ত সামান্য অপরাধে ছেলেটির এই খুনের বিচার, ভালো লেগেছিল সেদিন মনে হয়েছিল, পুরু চামড়ার তার এই, স্বজাতিগুলোর কাছে, রাষ্ট্রের অনেক ঋণ। এবার বুঝি, তার শোধ নেবার পালা। প্রতিটি মুণ্ডচ্ছেদে, ছেলেটির কানে বেজে উঠত, অপৌরষেয় শঙ্খধ্বনি। যেমনটা টুসুর ভোরে, সে শুনতে পেত, কোপান নদের ধারে দেশের ভেতর আরেকটা দেশ, একটা সমান্তরাল পৃথিবী যেখানে মেঘের আলজিভে, ক্ষুধা, লাল হয়ে ঝরে পরে, এই শুকনো জামবনি, আর তার আশেপাশের ইতর অববাহিকায়।

লোকগুলো মাঝে মাঝে, গ্রামে এসে নাটক করত। এই ছেলেটার বয়সী, অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে, একসাথে করে। শহুরে নাগরিকতার কাছে, চিরন্তনী অপাংক্তেয়, গরিব মানুষগুলোর মনে, শ্রেনীবিহীন সমাজ চেতনা গড়ে তোলার জন্য। কখনও ছেলেটিও সেই নাটকে, গাছ হয়েছে, উদ্বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কত শত বৈবস্বত কাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে, হাতের আঙ্গুলগুলো এঁকে বেঁকে গেছে, বৈশাখী বিকেলে, দমকা হাওয়ার, নম্র শরীরী কাব্যের ছন্দ বেয়ে। আজ আবার ছেলেটি, দুটো শীর্ণ হাত তোলে, আকাশের দিকে, সেই বৈদিক জ্যোৎস্নার শূন্যতাকে, দুহাতে ছিড়তে চাওয়া, ভীষণ পূর্ণিমার ধারায়, শরীর ভেজানো, নিঃসঙ্গ ছাতের গা বেয়ে। গাছটার মগডালে, দুটো শালিক বসে ঝগড়া করছিল, নিজেদের ভেতর কখনও বনিবনা হয় না ওদের।উড়ে যায় একে অন্যকে ছেড়ে। মাধুরী সন্ধ্যের হাওয়ায়, শহরের আলোগুলোর ওপর, মলত্যাগ করতে করতে, উড়তে থাকে শালিকটি।ওরই নাম হয়তো, কোনোদিন কেউ দিয়েছিল বিপ্লব।

জামবনি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা, এখন ঠান্ডা পিস্তলের মত, শান্ত নির্জনতায় ডুব দিয়েছে, হয়তো আগুপিছু, আবার বছর তিরিশের জন্য। দরিদ্র দুপুরের, নাগরিকত্ত্বকে প্রশ্ন ছুড়ে, ধর্মীয় স্লোগান আর মালকোষী তাটে, বাজানো একাদশী চাঁদ হয়তো, আজ বিপ্লবেরই নামান্তর।

পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। নির্মল পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
২। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা।
৩। গৃহহীন পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।
৪। পরিশ্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান।
৫। বৃক্ষরোপণ ও কেঁচো সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।
৬। জব কার্ড হোল্ডারদের কাজের ব্যবস্থা।
৭। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৮। কর্মসংস্থানমুখী স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকার যুবকদের ঋণের ব্য
৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটানো।
১০। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

সরস্বতী টুডু
উপ প্রধান

মাবিয়া বেগম সেখ
প্রধান

কৃষ্ণবনে কুহেলিকা

আহমদ রাজু

অতুনুর সাথে যখন আমার শেষবার দেখা হয়েছিল তখন আকাশে দেখা গিয়েছিল পূর্ণিমার চাঁদ। বাতাসে নতুনের গন্ধ। দিগন্ত বিস্তৃত সাগর পাড়ে এক মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। আমি আপন মনে চন্দ্রস্নানে মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় অতুনু। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'অতুনু তুই !'

আমার কথা শুনে সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, 'ভগবান সত্যিই আছে রে। না হলে তোকে এভাবে পাবো বুঝতেই পারিনি।'

অতুনু আমার মতো বিস্মিত হলো কিনা বুঝতে পারি না। বলল, 'আমিও তো ভাবতেই পারিনি তোর সাথে এই পূর্ণিমা তিথিতে দেখা হতে পারে। অবশ্য সে আশা কখনও করি না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তোকে আশা করেছিলাম; জানিস?'

'কেন, আমাকে আবার তোর কী প্রয়োজন ?' অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুর অতুনুর কণ্ঠে।

'প্রয়োজনতো অনেক।তোকে কোথায় না খুঁজেছি। আমার বিশ্বাস ছিল,তোকে একদিন না একদিন খুঁজে পাবোই। তবে আজ এই সময়ে পাবো, তা অবশ্য ভাবিনি।'

'তোর কথা শুনে ভাল লাগছে। আমাকে যে কেউ খুঁজতে পারে তা এখন আর মনেই হয় না।'

'তোর এই অলীক ধারণা যে ভুল, তা বুঝতে পারিস? আমার মন ডেকে বলছিল, তুই এবার হয়তো আসবি। অবশ্য প্রতিবছর তেমনটাই মনে হয়েছে।'

কোন কথা বলে না অতুনু। সে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেবেলায় আমি আর অতুনু প্রতি বছর পূর্ণিমা তিথিতে সাগরপাড়ে আসতাম। পুণ্যস্নান- চন্দ্রস্নান আরো কত কী। যে কারণে আমার বরাবরই মনে হয়েছিল, অতুনু বাড়িতে না ফিরলেও একদিন না একদিন এখানে আসবেই। তাইতো আমি প্রতি বছর এখানে আসতে ভুল করি না; যতই কাজ থাকুন না কেন। যদিও আগেকার দিনে এমন জমজমাট ছিল না। বছর যত পার হয় লোক সমাগম ততই বাড়ে। থাকার ব্যবস্থা-খাবার ব্যবস্থা সবই আছে।

অতুনু ক্ষণেক পরে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলে, 'জানিস, আমরা কেউ কখনও ঐ চাঁদের মতো হতে পারি না। কত সজীব, কত বিশস্ততা তার !'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'তুই ঠিকই বলেছিস, আমাদের মতো ওর কোন চাওয়া নেই-পাওয়া নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই।'

ক্ষণেক নীরব থেকে বললাম, 'অতুনু, কেমন আছিস বন্ধু ?'

সে একটা চাপা শ্বাস নিয়ে বলল, 'তুইতো একটা কঠিণ প্রশ্ন করে ফেললি। পূর্ণিমার চাঁদের কাছে প্রশ্ন কর তো, সে কী বলে? হয়তো বলবে, ভাল আছি-খুব ভাল আছি; ইত্যাদি ইত্যাদি।'

প্রসঙ্গের বাইরে কথা বলতে দেখে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বললাম, 'অতুনু তুই কি পাগল হয়ে গেলি ?'

সে এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বলল, 'পাগল! হ্যা, পাগল-ই। এই একই কথা বহু বছর আগে কেউ একজন বলেছিল।'

আমি অতুনুর দুই বাহু শক্ত করে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, 'অতুনু আমার দাদা, বন্ধু আমার; বলনা, কেমন আছিস তুই ? এখন কী করছিস ?'

অতুনু বিদ্রুপের ছলে হেসে বলল, 'ভাল আছিরে।'

'কী করছিস এখন?' প্রশ্ন করলাম।

'কিছু না, অথচ অনেক কিছু। এতবড় আকাশের নিচে আমাকে কিছু করতে হয় না। কর্মই আমাকে চালিয়ে নেয়।'

আমি সুযোগ বুঝে কথাটা বললাম, 'নিরু এখনও তোর অপেক্ষায় আছে।'

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় অতুনুর শরীরে যা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট বুঝতে পারি। এতক্ষণ সে চাঁদের

দিকে তাকিয়ে ছিল। কথাটা শোনামাত্র আমার দিকে ঘুরে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'কে নিরু?' যেন এই নামটা সে আজই প্রথম শুনলো।

'নিরুপমা। তোর নিরু।'

'কী আবল তাবল বকছিস! আমিতো ঐ নামে কাউকে চিনি না!'

'আমি সব জানি। আমার কাছে তুই কিছু আর লুকাতে পারবি না। সে আজও তোর অপেক্ষায় আছে।'

'বাদ দে তো এসব।'

'আমি সত্যি বলছি অতুনু, নিরুপমা আজও তোর পথ চেয়ে আছে।'

'যতসব ফালতু কথা- সব আজগুবি কথা।' অতুনু আমার কথা বিশ্বাস করে না।

বললাম, 'তুইতো জানিস, আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

'না; এ হয় না- হতে পারে না!'

'কেন? কেন হতে পারে না?'

'কেন হতে পারে না অন্তত তুই ভাল করেই জানিস।'

'আমি যেটা জানি সেটা তোর জানা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেটা জেনে তুই নিজেকে আড়াল করেছিস তা তোর একতরফা সিদ্ধান্ত।'

'আমি আসিরে।' বলে আবারো নিজেকে আড়াল করতে উদ্যত হয় অতুনু। আমি ওর হাত টেনে ধরে বললাম, 'আজ কোনভাবেই তুই পালাতে পারবি না। শুনতেই হবে, সেদিনের কথা। যে দিনটা তোকে উদভ্রান্ত পথিক করেছিল।'

'আমি কিছু শুনতে চাই না প্লিজ।'

'সত্যটা তোকে আজ জানতেই হবে। এটা আমার আত্মতৃপ্তি। ওর নীরবতা দেখে বললাম, 'নিরুপমা আমার স্ত্রী তাইতো?'

অতুনু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

বললাম 'না। সে আমার স্ত্রী নয়।'

কথাটা শুনে অতুনুর হৃদয়ে অন্য এক বাতাস বইতে থাকে। বলল 'তাহলে সেদিন যে.....'

'নিরুপমার সাথে তোর যে সম্পর্ক ছিল সেকথা আমাকে কখনও জানতেও দিসনি। না তুই- না সে। যখন আমার সাথে নিরুপমার বিয়ের পাকা কথা হলো তখনও না। সাত পাকে বাঁধা পড়ার পর বাসর ঘরে যাবার আগেই তোর দীর্ঘ অনুপস্থিতি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'একটা বিষয় আমার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারি। সে কারণে বাসর ঘরে যেয়ে নিরুপমার ডান হাত টেনে আমার মাথার ওপর নিয়ে দিব্যি দিয়ে বলি আসল সত্যটা বলার জন্যে। তখন নিরুপমা তোর সাথে সম্পর্কের বিষয়টা জানায়। এমনকি তুই তাকে নিরু বলে ডাকিস সেটাও। তখন থেকে তাকে আমি আলাদাই রেখেছি-আলাদা থেকেছি। সমাজে-সংসারে নামে মাত্র আমরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু আদতে সে আমার আশ্রয়ে থেকে তোর অপেক্ষায় দিন গোনে রোজ।'

অতুনু আমার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলল, 'পুষ্পক তুই....'

বললাম, 'সত্যি; নিরুপমা তোর ছিল- তোর আছে।'

নিরুপমা মূল অনুষ্ঠানস্থলের পাশে ছিল। আমার আসতে দেরি দেখে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারে অতুনুর সামনে। দু'জনার চোখাচোখী হতেই আনন্দে নিরুপমার চোখ ভিজে যায় অথচ মুখ দিয়ে তার কোন প্রকাশ পায় না। সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি চাইনি ওদের মাঝে থাকতে। সত্যি কথা বলতে কী, আমার নিজেকে আজ বেশ হালকা হালকা লাগছে। কারো মুখে কোন কথা নেই দেখে আমি নীরবতা ভেঙে বললাম, 'তোরা কথা বল, আমি আসছি।'

হোটেলের দিকে পা বাড়াতেই অতুনু আমার হাত টেনে ধরে সকল ভাবনাকে পেছনে ফেলে বলল, 'পুষ্পক, তুই নিরুকে গ্রহণ কর। আর হ্যাঁ, আমার জন্যে অপেক্ষার এই বছরগুলো তো ফিরিয়ে দিতে পারবো না; তবে শুভ কামনা তো করতেই পারি। আমার ভালবাসা রইল। ভাল থাকিস তোরা।' কথা শেষ করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আঁধারের মাঝে হারিয়ে যায় অতুনু। আমি আর নিরুপমা অতুনু বলে বার কয়েক চিৎকার করে ডাকলেও সে পেছন ফিরে একবারও তাকায় না।

তুলসী

মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

তেইশ বছরের তুলসী ছ'বছরের অহনাকে নিয়ে দিদার কাছে এলো। সহ্য করতে পারলো না বরের অন্য মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি। বামুনগিন্নি যেদিনে বললো ,কড়াইটা সাদা করে মাজিস তুলসী। কাজে তোর মন থাকে না বলেই তোর মিনসে সাঁওতাল পাড়াতে তাড়ি গিলতে যায়। শুনেছি একটা মেয়ে নাকি তার প্রেমে পড়েছে।

চমকে ওঠে তুলসী।সে এইসব সাতপাঁচই ভাবছিল। কড়াই মাজতে মাজতে বরের বেলেল্লাপনা। শুধু শোনে নি সে। দেখেছেও। সাঁওতাল টুসু ছুঁড়িকে একরাতে তো তাদের ঘরে এনেছিল। অহনা মাসির বাড়িতে ছিল। তুলসী সে রাতে বাইরে মাচানে শুয়ে ঘুমাতে পারে নি।

মরতেও ভয় । অহনাকে সে মানুষ করবে।লেখাপড়া শেখাবে । মরলে মেয়ের কি হবে!

হাতের কাজ সেরে গিন্নিমাকে প্রণাম করে বললো- মা,আমি বেইমানি করবো না। তুমি সবই জানো। তবে শোনো।এখানে আমি আর থাকবো না।মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছি দিদার কাছে।

পুর্ব বর্ধমানের অজ পাড়াগাঁ এড়ুয়ায় এসেছে তুলসী। দিদা কীর্তন গানের দলে ঘোরে ।দোয়া টানে। 'জয় নিতাই ' বলে দিন যায়।

তুলসীকে বললো থাকো। নিজের পেট নিজেই চালাতে হবে। থাকতে না করবো না। ঘর গৌড়সুন্দরের। প্রেভুর ইচ্ছেয়। জয় নেতাই!

রাতে আমি ঘরে থাকি না ।কখনো ফিরতে দু'চারদিনও হয়।

তুলসী গমের জমি থেকে বেতোর শাক,পুকুর পাড়ের কলমীর শাক তুলে ভাগ ভাগ করে বাড়ি বাড়ি বেচে। কাজের খোঁজ চালাচ্ছিল। রান্না, বাসন মাজা, শিশুর পরিচর্যা যাইহোক।

বসাকগিন্নি বললো,তোমাকে কাজে নেবো । শাশুড়িমাকে দেখবে।মেয়ের ব্যবস্থা আমার কর্তা করে দেবে। অনাথ আশ্রমে রাখতে রাজী?

মেয়েকে তো বাড়িতে রাখতে পারবো না। আমার দুটি সন্তান।ওদের সমান খরচে মানুষ করতে পারবো না । তখনই তোমার মনে হবে অহনাকে দুই দুই করছি।

তুলসী রাতে বোঝায় মেয়েকে। দমা-রে,আমাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবি মানিয়ে? থাকবি কেমন!

দেখছিস তো,বাবা খবর করে না। আমরা কেমন করে পেট চালাবো?

মেয়ের প্রশ্ন -কার কাছে থাকবো?

শুনেছি অনেক ছেলেমেয়ে থাকে।পড়া ,গান, খেলা , গাছ- লাগানো সব করতে হবে।খাওয়া পরার সব ব্যবস্থা ওরাই করবে।

মাঝেমধ্যে দেখে আসবো ।

মেয়ে চুউপ।মা তাকে জাপটে ধরে একটা লম্বা শ্বাস ফেললো।

তবে ওদের বলি - রাজি?

মাকে আঁকড়ে বুকে মুখ গুঁজলো। অস্ফুটে জানালো বলো ।

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :

facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

অসূয়া

রবীন বসু

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল মৌসুমী। বাড়ির কাছে আসতেই গানের রেশ ভেসে এল কানে। এত তাড়াতাড়ি তো গানের স্যারের আসার কথা না। তাহলে!

বাড়িতে ঢুকে দেখে, বসার ঘরে ছোট বোন মৌমিতাকে গান তোলাচ্ছে সুদর্শন স্যার। সাধারণত এ সময় আসে না, অন্য টিউশন থাকে। কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি কেন ? তাছাড়া সেও তো শিখবে ! কলেজ ছুটির পর বিকেলে সাধারণত স্যারের আসার কথা। আর একটা ব্যাপারে মৌসুমির খটকা লাগল।স্যার যেন একটু বেশি ক্লোজড হয়েছে মৌ-য়ের ! ওরা গানে ডুবে ছিল।কেউ-ই তাকে খেয়াল করেনি। নাক উঁচু মৌসুমী এতদিন কোনও পাত্তাই দেয়নি সুদর্শনকে। সাদামাটা চেহারার সামান্য এক প্রতিবেশী যুবক। গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে বিএড করেছে।এসএসসি দিয়ে পাশ করে ইন্টারভিউয়ের পর প্যানেলে নামও উঠেছিল।কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে আজও চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে আসেনি। বাবা রিটায়ার করার পর সংসারের অবস্থা এখন সঙ্গিন। বড় ছেলে হিসেবে সুদর্শন তাই চাকরির অপেক্ষায় আর বসে থাকতে পারেনি। এক সময় সখ করে সে গান শিখত। পাড়ার বাণীচক্রে নিয়মিত যেত। সেখানে পণ্ডিত রমেশ আচার্যের নজরে পড়ে। তারপর তাঁর তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত শেখা। সেই সংগীতকে পাথেয় করে সে এখন অভাবী সংসারে তার বাবাকে সাহায্য করছে। সকাল বিকেল বেশ কয়েকটা গানের টিউশন করে সুদর্শন। সেই হিসেবে তাদের বাড়ি আসা। ছোটবোন মৌয়ের গলায় ভাল সুর আছে। গান শেখায় তার বেশ আগ্রহ। কিন্তু মৌসুমীর ততটা আগ্রহ নেই। পড়াশোনায় তার মন বেশি। সে চায় ভাল রেজাল্ট করে ভাল কোনও চাকরি করবে। কিন্তু মা বলল, মৌ-কে শেখাতে স্যার যখন আসছে বাড়িতে, তুই-ও শেখ। বিয়ের বাজারে কাজে লাগবে। মৌসুমী আর আপত্তি করেনি। সেই থেকে দুই বোনের সুদর্শন স্যারের কাছে গান শেখা শুরু।

এখন সে ছোটবোনের প্রতি জেলাস হল। অসূয়াপূর্ণ গলায় বলে উঠল, সেকি স্যার, আপনি আজ এত তাড়াতাড়ি ?

হারমোনিয়ামের রিড থেকে আঙুল সরিয়ে গান বন্ধ করে সুদর্শন মুখ তুলে দেখে সামনে মৌসুমী।মৌমিতাও দিদিকে দেখে।

;হ্যাঁ, আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেছি। আগামীকাল মৌমিতার স্কুলে শিক্ষক দিবস।ওকে একক এবং সমবেত ভাবে অনেকগুলো গান গাইতে হবে। তাই আজ একটু বেশি সময় নিয়ে গানগুলো তুলে দিতে এসেছি।

কিন্তু আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, কয়েক সপ্তাহ আগে আমার কলেজ সোশ্যাল ছিল, আপনাকে রবিবার আসতে বলেছিলাম, তখন আসেননি তো ! মৌসুমীর গলায় বিদ্রূপের ঝাঁঝ।

সেদিন আমার চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। তোমাকে বলেছিলাম সে কথা। তাই আসতে পারিনি।

কী এক দুর্বোধ না-বোঝানো যন্ত্রণায় মৌসুমি তখন অস্থির। হিসহিসে গলায় বলে, বোনের প্রতি আপনার ফিলিংসটা বোধহয় একটু অন্য রকম, স্যার !

শাট আপ, মৌসুমি। ভেবেচিন্তে কথা বল। আমি তোমাদের স্যার ! অপমানিত সুদর্শন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

শান্ত আর নম্র স্বভাবের মৌমিতা দিদির এই ব্যবহারে হতবাক। লজ্জিত। সে কঠিন গলায় বলল, কী বলছিস দিদি! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? ছিঃ !

ছিঃ তুই কি বলবি ! আমি বলছি, ছিঃ! মৌসুমী একবার কড়াভাবে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে চায়।

মৌমিতার চোখ ততক্ষণ জলে ভরে গেছে। সে মুখ নিচু করে নম্র স্বরে বলে, সরি স্যার। আমি দিদির হয়ে ক্ষমা চাইছি।

ওকে। ঠিক আছে। কাল তোমার প্রোগ্রাম, না হলে আমি এখনই চলে যেতাম। এসো, বসো।

সেদিনের পর অনেক দিন সুদর্শন আর গান শেখাতে আসেনি। কারণ জানতে চাইতে মৌমিতা মাকে সেদিনের ঘটনা সব বলে। বলে দিদির অসভ্যতার কথা। তখনই মৌসুমীকে ডেকে মা বলেন, তুমি যখন স্যারকে অন্যায় ভাবে অপমান করেছো, তখন তুমিই ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনবে। তুমি গান না শেখো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার জন্য মৌ কেন সাফার করবে !

মৌসুমীও পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবেছে, সেদিনের

ব্যবহার ঠিক হয়নি। কেন সে অত উত্তেজিত হয়ে গেল! মৌ তো ছোট, ওকে নিয়ে এসব ভাবা উচিত হয়নি। তবে কি সে ভিতরে ভিতরে এক অসূয়াতে ভুগছিল ! যতই সাধারণ আর ছাপোষা ভাবুক সে সুদর্শনকে, মনের কোনও কোণে কি তার ছাপ পড়েছে ! সরল আত্মমগ্ন মুখ আর উদাস দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করেছে ! তাই কি বোনের সঙ্গে মগ্ন ভাবে গান গাইতে দেখে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে ! তার মধ্যে জেগে ওঠে এক হিংসুটে মনের মৌসুমী !

উলটো দিকে সুদর্শনও ভাবে, না যাওয়াটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আসলে মৌসুমী খুব জেদি অহংকারী। তার মুখের উপর কেউ না বলুক সেটা সে টলারেট করতে পারে না। হয়তো রূপসী আর পড়াশোনায় ভালো বলে তার এই অহঙ্কার। সেবার কলেজ সোশ্যালে গান গাইতে চান্স পেয়ে সে নিজেকে উজাড় করে দিতে চেয়েছিল। চেয়েছিল সবাই তার প্রশংসা করুক। আর ছোটবোন মৌমিতাকে বোঝাতে চেয়েছিল, সব দিক দিয়ে সে-ই সেরা। তাই আগের দিন রবিবার সে স্যারকে আসতে বলেছিল ভাল করে রিহার্সাল দেবে বলে। স্যার না করায় মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল। সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সেদিন। এই রবিবার থেকে আবার সে গান শেখাতে যাবে সিদ্ধান্ত নিল।

কী কারণে আজ কলেজ ছুটি ছিল। তবু মৌসুমী বিকেলে বের হল। উদ্দেশ্য সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করা। সে জানে শনিবার স্যার গাঙ্গুলি বাগানে গান শেখাতে যায়। পাড়ার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। সুদর্শন এ পথেই বাইক নিয়ে যাবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখে সুদর্শন আসছে। মোড় ঘুরতে যাবে, মৌসুমী গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। সুদর্শন অবাক হয়ে সাইড করে বাইক থামায়।

মৌসুমী বলে, আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

সুদর্শন জানতে চায়, কী কথা ?

চলুন না, পার্কে গিয়ে বসে বলি।

সময় লাগবে কি ? আমি তো টিউশনে যাচ্ছি।

তা একটু সময় লাগবে। একদিন না হয় দেরিতে গেলেন।

মৌসুমীর চোখে কিছু কি ছিল ! সুদর্শন আর না করতে পারেনি। তাছাড়া ওর উপর রাগও অনেক কমে গেছে। কৌতূহল বাড়ে। সে বলে, দাঁড়াও, আমি ফোন করে টিউশন বাড়িতে বলে দিই, দেরিতে যাব।

এরপর ওরা পার্কে ঢোকে। মরা বিকেলের রোদ গাছের মাথায়। অনেক পাখি ডাকছে। সুদর্শন বাইক স্ট্যান্ড করে। তারপর দু'জন একটা বেঞ্চে বসে। কিছুক্ষণ সুদর্শনের লাল বাইকটা দেখে এক সময় মৌসুমী বলে, আমার খুব ইচ্ছে, আপনার বাইকের পিছনে বসে একদিন সারা কলকাতা ঘুরি। বিখ্যাত সব স্ট্রীট ফুড খাই।

ভাল তো ! তারপর ঠেস দিয়ে বলে, কিন্তু আমার বাইকে আপনি উঠবেন ! ইগোতে লাগবে না !

মৌসুমী লজ্জা পায়।;যদি নাই উঠি, তাহলে বললাম কেন ! অভিযোগ গলার সুরে।

ব্যাপারটা সহজ করার জন্য সুদর্শন বলে, বেশ তো, নিয়ে যাব। তবে মাসের প্রথমে। তখন হাতে টাকা থাকবে।

দু' জনেই শব্দ করে হেসে ওঠে। এবার সুদর্শন বলে, কী কথা বলবে যে!

;ওঃ হ্যাঁ! কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৌসুমী বলে, সেদিনের ব্যবহারের জন্য মাপ চাইছি। আমার উচিত হয়নি ওরকম ব্যবহার করা। আসলেখ

আসল কী ?

আসল হল আমি কখন যে আপনাকে.....

আমি জানি তো! তাই যাতে তোমার হিংসে হয়, ইচ্ছে করে মৌমিতার ক্লোজ হয়ে গান গাইছিলাম, দেখি তুমি রেগে যাও কিনা ! যদি রেগে যাও, তাহলে বুঝব তুমি আমাকে ভালবাসো।তখন এই ভ্যালেনটাইন ডে-তে লাল গোলাপ দিয়ে প্রপোজ করব, ঠিক করেছিলাম। তুমি যা রাগী, আগে তো করবে না !

আপনি এত দুষ্টু ! থাকেন তো ভিজে বেড়াল হয়ে!

কী করব বলো ! বাঘের ঘরে গান শেখাতে যাই যে!

সেদিন সন্ধে বাড়ি ফিরে ছোটবোন মৌ-কে জড়িয়ে ধরে মৌসুমী বলে, জানিস বোন, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে! তোর সুদর্শন স্যার না খুব ভাল ! খুব! আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে !

মৌমিতা বুঝতে পারে না দিদির আজ কী হল ! চির শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ! রসায়নটা বোঝার জন্য সে দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সেখানে তখন খুশির অথৈ সাগর। অসূয়া কখন যে প্রেমে পরিণত হল মৌমিতা বুঝতে পারল না।

স্মৃতিতর্পণ

লাজবী মুখার্জী

অমল একটি অতি সাধারণ ছেলে। ছোটথেকে অনেক কষ্ট করে, অনেক লড়াই করে সে বড় হয়েছে। দারিদ্রতার সাথে তার লড়াই তো সেই জন্ম থেকেই। জন্ম থেকেই সে মাকে দেখে বড় হয়েছে। বাপের হদিশ তো জন্মকাল থেকেই নেই। অমলের মাকে বিয়ে করে, তাকে গর্ভবতী করে তার বাবা চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথে। বাবা থেকেও না থাকার জ্বালাটা অমল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ছোটবেলা থেকেই ! কথায় কথায় ওকে শুনতে হতো বেজন্মা অপবাদটা ! ওর মায়ের চরিত্র নিয়েও লোকে কম কথা তো আরবলেনি ! অমল যখন ছোট তখন থেকেই অমলের মা লোকের বাড়িতে কাজ করে। বস্তির একটা ছোট ঘরে মা আর ছেলে খুব কষ্ট করে দিন কাটাতো। ছোট বয়স থেকেই অমল ওর মায়ের সাথে তার কাজের বাড়িতে যেতো। তাদের বাড়িতেই অমল দেখতো বড়লোক বাবুদের সব ছেলেমেয়েরা দামী দামী খাবার খাওয়ার থেকেও কীভাবে নষ্ট করে তখন থেকেই বড়লোক বাড়ির ছেলেমেয়েদের প্রতি ওর একটা রাগ জন্মেছিল। অমল বড়লোক বাড়ির ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন স্কুলে যেতে দেখতো। ওদের স্কুলে যেতে দেখে ওর খুব ইচ্ছে করতো স্কুলে যেতে, পড়াশুনা শিখতে ! অনেকবার অমল মায়ের কাছে এই নিয়ে বায়নাও করেছে। যখনই অমল এই নিয়ে বায়না করেছে তার মা চোখ পাকিয়ে অমলকে ধমকে বলেছে - ক্ষ্ম যার বাপ নেই তার অত সাধ কিসের ?ক্ষ্ম অমল বুঝতো যে, অনেক জ্বালা নিয়ে তার মা এই কথাগুলো বলে তাই সে কোনদিন কোন কথার প্রতিবাদকরতোনা ! অমলের বয়স যখন বছর পাঁচেক ঠিক তখনই অমলের মা কাজ নিল অশোক চক্রবর্তী নামের একজন স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ও একটিমাত্র পুত্রকে নিয়ে ছিল ছোট্ট একটা সংসার। স্কুলের অনেক গরীব ছেলেরাই তার কাছে পড়তে আসতেন। মেধাবী, গরীব ছেলেদের তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। ছাত্ররা ছিল অশোক মাষ্টারমশাইয়ের কাছে সন্তানসম আর সকল ছাত্রদের কাছে অশোক মাষ্টারমশাই ছিলেন পিতৃসম। অমল মায়ের সাথে অশোক মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ি গেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ওনার পড়ানো দেখতো ও উনি যা যা ছাত্র ছাত্রীদের পড়াতেন অমলও সেই শুনে শেখার চেষ্টা করতো। একদিন এই বিষয়টা অশোক মাষ্টারমশাইয়ের চোখে পড়ে গেল। অশোক মাষ্টারমশাই দেখলেন, ছেলেটার পড়াশুনাতে প্রচন্ড আগ্রহ এই দেখে অশোক মাষ্টারমশাই সিদ্ধান্ত নিলেন অমলকে তিনি লেখাপড়া শেখাবেন। অমলকে লেখাপড়া শেখানোর প্রস্তাবটা অমলের মায়ের কাছে রাখতেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। অমলের মায়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে অমলকে দিয়ে কুলি মজুরের কাজ করিয়ে পয়সা উপার্জন করানো ! অমলের বাপটা চলে যাবার পর থেকেই অমলের মায়ের প্রচন্ড রাগ ছিল অমলের ওপর। কথায় কথায় অমলকে তিনি বিভিন্নভাবে খোঁটা দিত। অশোক মাষ্টারমশাই পণ করলেন অমলকে তিনি লেখাপড়া শেখাবেনই সেই লক্ষ্য নিয়ে অমলকে তিনি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে অমলের মা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বছর দুয়েক তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন।তখন মাকে বাঁচাতে অমল মরিয়া হয়ে উঠল। পড়াশুনা বন্ধ রেখে অমল তখন ঠোঙা বানানোর কাজে যুক্ত হল কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা ! অমলের মা মারা গেলেন। অমলের তখন বয়স ৮বছর। মাকে হারিয়ে অমল যখন সর্বহারা হয়ে গেছে ঠিক তখন আবার তার কাঁধে এসে হাতটা রাখলেন সেই অশোক মাষ্টারমশাই। সেই তখন থেকেই অমলের পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাকে পিতৃস্নেহে অতি যত্নে আগলে বড় করেছে অশোক মাষ্টারমশাই। উচ্চবিদ্যালয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে অশোক মাষ্টারমশাই অমলকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সন্তানের থেকেও বেশি যত্ন, ভালোবাসা আর অপত্য স্নেহ দিয়ে অশোক মাষ্টারমশাই বড়ো করেছিলেন অমলকে। কালের নিয়মে আজ সবটাই অতীত। গত পাঁচ বছর হল অশোক মাষ্টারমশাই গত হয়েছেন। অমল আজ অনেকটাই পরিণত। অশোক মাষ্টারমশাই যে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অমলও আজ সেই একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছে। আজ অশোক মাষ্টারমশাইয়ের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী তাই তার স্মৃতিকে আগলে রেখে তারই ছবির সামনে বসে অমল চিঠি লিখছে। চিঠিতে সে লিখছে তার মনের কথা তার প্রিয় মাস্টারমশাইকে। প্রতিটি মুহূর্তে তার ভাবনায় সে অশোক মাষ্টারমশাইয়ের সক্রিয় উপসি্হতি অনুভব করতে পারছে। অমল নিজেও জানেনা এই চিঠি সে কোন ঠিকানায় পাঠাবে বা আদৌ তার উত্তর আসবে কিনা তবু সে অসীমের- অনন্তের ঠিকানায় তার মাষ্টারমশাইয়ের চরণে তার অন্তরের শ্রদ্ধার পাত্রখানি উজাড় করে লিখে চলেছে.....

ঠিকানা -অচিনপুর,
আকাশপথ,
অনন্তলোক....

শ্রদ্ধেয়মাষ্টারমশাই,

আশা করি, মহাবিশ্বের সাথে সকল বন্ধন ছিন্ন করে যে অনন্তের, অসীমের, অমৃতের সন্ধানে আপনি পদার্পণ করেছেন সেখানে আপনি ভালো আছেন। সময় হয়তো আপনার সাথে বহুযোজন দূরত্ব সৃষ্টি করেছে তবে ওই যে অন্তরের গভীরে আপনার সৌম্যকান্তি চেহারার, শিশুসুলভ হাসির মুখখানি স্মৃতির ভেলায় আজও ভেসে চলেছে আর তাতেই আমি খুঁজে নিয়েছি আমার শ্রদ্ধার পরম আশ্রয়। মনে প্রশ্ন জাগে,

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে জীবনের পরপারে যিনি পথ হেঁটে যান তিনি কি সত্যিই অমৃতসুধার সন্ধান পান? আপনিও কি সেই সন্ধান পেয়েছেন? জানিনা এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে কিনা তবে কিছু প্রশ্ন নিরুত্তরেই যেন বেশি সুন্দর। মন সব বোঝে, সব জানে তবু প্রশ্ন করেই যেন সে সুখের চাবিকাঠিটা খুঁজে নিতে চায়। জানেন আজকাল কিছু লিখতে গেলে কলমটা যেন কেঁপে ওঠে! বুকটা হু হু করে ওঠে শূন্যতায়, মনটা নিঃশব্দে কেঁদে ওঠে আর জানতে চায় কে আর দেবে এই লেখার উৎসাহটুকু! কে আর আমার প্রাপ্তিতে আনন্দে বুক ভরাবে! শিক্ষক দিবসের দিনগুলো ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, মনের সাথে প্রবল সংঘর্ষ হয় আর মনে পড়ে যায় স্মৃতিরমণিমাণিক্যে উজ্বল সেইসব দিনগুলোর কথা যখন আমার অতি স্বল্পপ্রদেয় একটা কলম ও চিনিবর্জিত মিষ্টিতে আপনি খুঁজে নিতেন পরম সুখ আর আমি পূর্ণ হতাম আপনার আশীর্বাদ ও স্নেহসুধার বারিধারায়। জানেন মাষ্টারমশাই, আজকাল গুরুশিষ্য সম্পর্কটা অনেকটা অদৃশ্য ডাইনোসরের মতো হয়ে গেছে! গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের সৌজন্যতা বা শ্রদ্ধাবোধ আজ সামাজিক মাধ্যমের কতগুলো ছবিতে সীমাবদ্ধ হয়েছে। সবাই যেন ছুটে বেড়াচ্ছে! স্বল্পপ্রাপ্তিতে কেউ সুখ খুঁজে পায়না, সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে অনেক বেশি বেশিই পাবার লক্ষ্য নিয়ে। আপনি বলতেন - আমি একদিন অনেক বড়ো হব, হয়েছিও বড়ো। তবে একটা কথা কি জানেন, এতটা উচ্চতায় পৌঁছতে পারিনি যেখানে আপনার অনুপস্থিতির শূন্যতা আমাকে গ্রাস করেনি! জানেন মাষ্টারমশাই, আমার ভারী আকাশ দেখতে ভালো লাগে, মাঝে মাঝে আকাশ ছুঁতেও ভারী ইচ্ছে জাগে তবে ওই যে 'সময়' বলে একটা শব্দ আছে না! সময় যে সবসময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বাস্তব জগৎটা যে বড় কঠিন! জানেন মাষ্টারমশাই, পৃথিবী যেন আজ বড় অসহায় হয়ে পড়েছে! প্রকৃতি যেন হারিয়ে ফেলছে তার সৌন্দর্য্য ও ভারসাম্য! বড় কষ্ট হয় আজকাল কচিমুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ওরা যে গুরু শিষ্য পরম্পরার স্বাদ পেলনা! তবে কী জানেন মাষ্টারমশাই সেই যন্ত্রণাকে জয় করেও আজকাল খুঁজে নিতে চেষ্টা করি খুশির ঝলমলে এক চিলতে রোদ। আপনি শিখিয়েছিলেন, ভালো, মন্দ দুইই জীবনের অপরিহার্য্য উপাদান। তাই সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করেই মুখে হাসিটুকু রাখি আর রবিঠাকুরের এই মন্ত্রে নিজের অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ, পবিত্র করি। ''ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লহ সহজে''।

আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে, তবে এত কথা বলতে গেলে শব্দ গুলো যেন নদীর রূপ ধারণ করবে, কলমও হয়তো গতি হারিয়ে ফেলবে! জীবন আপনাকে মহাবিশ্বের যে পারেই নিয়ে যাকনা কেন! চোখ আপনাকে দেখতে যতই অসমর্থ হোক না কেন আমি এই বিশ্বাসেই অন্তরের তৃপ্তি অনুভব করি -

''জীবন মরণে সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে''। যেখানেই থাকুন পরম শান্তিতে থাকুন।

- ইতি

আপনার স্নেহের অমল

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন-

দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪। জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান।
৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

শুভজিৎ বারিক
উপ প্রধান

ভারতী মালিক
প্রধান

সম্পত্তি সমর্পন

বিজন গঙ্গোপাধ্যায়

(প্রায় সত্তর বছর আগে আমার কাকিমা- যূথীকা গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শোনা একটি সত্য ঘটনা, তবে নাম গুলি কাল্পনিক। - লেখক।)

বাংলা ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। গত যৌবনা দামোদরের বিস্তৃত বালুকা রাশি পার হয়ে দেখা যেত তারই পশ্চিম তীরের বিস্তৃত ভূমিতে পড়ে আছে, তার চেয়েও জীর্ণ-খিন্ন, দীন-হীন মরণোন্মুখ কঙ্কালসার গ্রামগুলো ! যাদের ইংরেজ শাসনের বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকেও বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি ! গ্রামের মানুষেরা সেই প্রাচীন পল্লির অস্থি জরজর ইতিহাস, আর প্রাচীনতম কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে ! যারা তখনও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের নবজাগরণের সভ্যতার সঙ্গে বিশেষ খাপ খাওয়াতে পারছিল না। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল দু- এক খানি- গ্রামে,মা খুবই অল্প !

সেই রকমই নিভৃত পল্লির একটি নিভৃত কুটিরে বাস করছিল পিতৃহীন বালক কানাই, তার বিধবা মায়ের আঁচলের নিশ্চিন্ত আরামে। আরামটা তার দৈহিক কি মানসিক সেটা বলা শক্ত। কারন এই দুটি প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য যে আর্থিক আনুকূল্য প্রয়োজন, তা তাদের ছিল না। বিধবা শশীবালা, পাড়ার লোকের ধানভেনে যে দুটো খুদকুঁড়ো পেত তা তাদের ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। একবেলা চললে অপরবেলায় বিধবা মাকে উপবাসে থাকতে হোত ! তাছাড়া মাঝে মাঝে দুবেলাই সংকট দেখা দিত। তাই কানাই তার ছোট্ট জীবনটাকে প্রকৃতির মুক্ত আনন্দের সঙ্গে বেশিক্ষণ ব্যাপৃত রাখত। ক্ষুধাকে সে একপ্রকার অগ্রাহ্যই করত। এই ভাবেই চলছিল তাদের সংসার !

সেদিন মঙ্গলবার, দূরের গাঁয়ে হাট। হাটে চলেছে পথচারীরা, মাঠের আলপথ দিয়ে। খানিকটা দূরে একটা পাকুড় গাছের শান্ত ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল কানাই, তার সেই সাধের বাঁশিটা হাতে করে। গতবারের বোড়গ্রামের গ্বলরাম দেবের চক্ষুদান উৎসবের মেলায়, মায়ের প্রাণপাত কষ্টের দু-আনা সম্বল করে বাঁশিওলার কাছে সে দাঁড়িয়েছিল, বাঁশি কিনবে বলে। অনেকগুলো বাঁশি নেড়েচেড়ে এই বাঁশিটাকেই পছন্দ করে সে যখন বলল-'কতদাম' ? বাঁশিওলা বলল- চার আনা।... চারআনা ! দাম শুনেই কানাই তখন পৃথিবীকে অন্ধকারে ঘুরতে দেখেছিল, আর সেই সঙ্গে দেখেছিল তার কতদিনের স্বপ্ন মিশে যাচ্ছে সেই অন্ধকারের নির্মম পরিহাসে ! তবুও দু-হাতে সেই বাঁশিটাকে চেপে ধরে সে বলেছিল- 'দু-আনা হবে না?" বাঁশিওলা হেসেছিল তার রকম দেখে। কিন্তু কেন জানিনা কানাই পেয়েছিল সেই বাঁশিটা, দু-আনার বদলেই। মনে হয় তার চোখের জলেরই জিৎ হয়েছিল !...

আজ পর্যন্ত একান্ত প্রিয় সেই বাঁশিটাই তার দুঃখ সুখের একমাত্র সঙ্গী। সে বাঁশি বাজাচ্ছিল, আর বাজায়ও বেশ ভালো। ধীরে ধীরে বেলা বাড়ছিল;আজ আর খাবার কিছুই নেই। মা বলে গেছে, ধানভেনে এসে ভাত রাঁধবে।কানাই এটারই যেন সুযোগ খুঁজছিল। মা চলে গেলে সে একটু ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে আসতে পারবে।ঐ যে দক্ষিনের মাঠটা, যেখানে তার চির সাথি ঐ পাকুড় গাছ, আর ফাঁকা মাঠের মাঝে জলভরা পুকুরটা।ধারে ধারে কত শালুক শাপলার দল। কতদিন সে পুকুরে সাঁতার কাটতে কাটতে ভেবেছে- যদি সে পানকৌড়ি হতো, বক হতো কি মজাই না হতো ! পানকৌড়ির মতো জলে ডুবেডুবে মাছ ধরা ; একডুবে এপাড় থেকে ওপাড়েতে গিয়ে ওঠা ! ওঃ কি মজাই না হতো ! সে মনে মনে এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল, পাকুড় গাছটার নিচে বাঁশি বাজাতে বাজাতে। কাছেই তার প্রিয় কুকুর ভুলুও তার দিকে চেয়ে লেজ নাড়াচ্ছিল।

হঠাৎ কানাইয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। পাড়ার বিন্দে পিসি তাকে ডাকছে 'কানাই.... ও কানাই, একবার এদিকে আয় বাবা। হরিণের মত ছুটল কানাই। পিসির কাছে গিয়ে বলল- 'কি পিসি, কি হয়েছে গো?' পিসি বলল- 'কিছু নয় বাবা, এদিকে একটু আয় বাবা, দরকার আছে।' কানাই কাছে এল, বলল- 'কি দরকার গো বলো? পিসি এবার কানাইয়ের হাতে একটা মিস্টি দিয়ে আদর করে বলল- 'তোর মা ধান ভানতে গেছে নারে ? কানাই - 'হ হ্যাঁ পিসি, কোন সকালে গেছে মা ; সেই সন্ধে বেলায় আসবে। পিসি বলল-'আহা তাই বই কি বাবা ; নে, নে মিস্টি টা

খেয়ে নে। আহা ক্ষিদেয় যে পেটটা একেবারে ঢুকে গেছে রে। কানাই মিষ্টি খাচ্ছে যখন, পিসি বলল- আচ্ছা দাঁড়াতো একটু, দেখি দুটো আনাজ নিয়ে আসি আমার জমিটা থেকে। আজ আমার কাছেই একমুঠো খাবি তুই।'... কানাই মিষ্টিটা খেতে খেতে বলল- 'আচ্ছা, আমি দাঁড়াচ্ছি। পিসি চলে গেল পুকুর পাড়ে তার বেগুন বাড়ির দিকে।

এই বিন্দে পিসির ছেলে পুলে নেই। প্রচুর সম্পত্তি রেখে স্বামী মারা গেছে। বিন্দে পিসিই এখন লোক রেখে চাষ-আবাদ চালায় ,বাগান-পুকুর দেখা শোনা করে। কানাইদের বাড়ির কাছেই তার মাটির দোতলা বাড়ি। তবে কানাইকে সে ভালোবাসে, মাঝে মাঝে ডেকে এনে খাওয়ায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই জমি থেকে বেগুন তুলে পিসি এসে গেল। সঙ্গে পিসির কাজের দুজন লোক,-- বাগদি পাড়ার হিরু আর ছিরু বাগদি। দুজনের হাতে দুটো কোদাল। পিসি তাদের কি যেন বলল, তারা দুজনে চলে গেল পুকুর পাড়ে।

কানাইকে সঙ্গে নিয়ে বিন্দে পিসি বাড়িতে এসে রান্না সেরে, কানাইকে ভালভাবে তেল মাখিয়ে বলল-'চল বাবা দুজনে নেয়ে আসি।' স্নান সাড়া হয়ে গেলে, পিসি নতুন একটা কাপড় কানাইকে পড়তে দিল। কানাইতো আনন্দে আটখানা। বলল- 'পিসি কাপড়টা কি সুন্দর গো! কাপড়টা আমায় দেবে ?' পিসি বলল, দেবো বই কি বাবা, সব তোকেই তো দেবো।' পিসি এবার বলল- 'কানাই একবার আয় তো বাবা আমার সঙ্গে; আজ আমার একটা ব্রত আছে ঐ পুকুর পাড়ে। পুজো হবে বাবা ,একটু আয় দেখি।'

কানাই, পিসির সঙ্গে পুকুর পাড়ে এসে দেখল একটা বড় গর্ত খোঁড়া হয়ে হয়েছে। পুকুরের ঈশান কোণের এই গর্তের মধ্যে পাঁচটা পিতলের ঘড়া সার দিয়ে বসানো; সরা দিয়ে এক ঘড়ার মুখগুলো ঢাকা ! গর্তের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে হিরু আর ছিরু। আর কেউ নেই।

কানাই বলল-'কি হবে গো পিসি? পিসি শুধু বলল- ঐখানেতেই পুজো হবে ; আয় আমাদের ওখানেই বসতে হবে।' পিসির সঙ্গে কানাই গর্তের মাঝখানে এলে, পিসি বলল-'বোস বাবা, বোস ; এই কুশ আসনটাতে বোস।' কানাইয়ের বেশ মজাই লাগছে। সে পিসির কথা মতো কুশ আসনটার উপরে বসলো। বলল-কি হবে পিসি? পিসি বলল আগে ধূপ আর প্রদীপটা জ্বালি, তারপর আমি মন্ত্রটা বলব, তুইও আমার সঙ্গে বলবি।' কানাইয়ের এবার ভয়ও করছে- কি জানি কি মন্ত্র ! পিসি ধূপ-প্রদীপ জ্বেলে একটা পিতলের থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে কানাইকে বলল-'এবার মন্ত্রগুলো বলতো বাবা। কানাই বলল-'মন্ত্র বলে কি হবে ?' পিসি বলল-'মন্ত্র বলতে হয় বাবা।' কানাই এবার বলল আমার ভয় করছে পিসি, আমি মন্ত্র বলব না।আমি মায়ের কাছে যাবো।'

পিসি বলল-ছিঃ বাবা, ও কথা বলতে নেই। ভয় কি বাবা, আমি তো রয়েছি। বল বাবা বল-'আমি কানাই দাস, এই সম্পত্তি তোমার কথামত তোমার জন্য রক্ষা করব। আবার তোমার পরের জন্মে তোমাকেই ফেরত দেব। আমি এই কথা দিচ্ছি ; বল বাবা বল।'

মন্ত্রটা শুনে কানাইয়ের হাসি পাচ্ছিল। সে এবার বলল- 'এই মন্ত্র ; আচ্ছা আমি বলছি।' কানাই এবার পিসির সঙ্গে আগাগোড়া কথাগুলো বলে গেল। তারপর বলল পিসি, এবার আমি যাই।' পিসি নৈবেদ্যের মিষ্টিগুলো কানাইয়ের হাতে দিয়ে বলল- আগে এগুলো খেয়ে নে।' কানাইয়ের মিষ্টি খাওয়ার সময় পিসি গর্ত থেকে উঠে আসছে যখন, কানাই বলল- পিসি দাঁড়াও, মিষ্টিগুলো খেয়ে নিই; ও পিসি ...ও পিসি ? .... কিন্তু তার কথা শেষ হলো না। রাশি রাশি মাটির মধ্যে তার ছোট্ট দেহটুকু অন্তর্হিত হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। সব শেষে পিসি বলল- হিরু, মাটি উঁচু হয়ে আছে ভালভাবে বসিয়ে দে।'...

সব কাজ শেষ হয়ে গেলে, পিসি ও তার সঙ্গীরা বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু কে যেন অলক্ষ্যে সব লক্ষ্য করছিল- সে কানাইয়ের কুকুর ভুলু। হায়, এতক্ষন ধরে সে তার প্রভুর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। সবাই এল তবু তার প্রভু এল না। সে ছুটে গেল খোঁড়া জায়গাটায়। দুপায়ে আঁচড়াতে লাগল মাটি। কিন্তু প্রভুর দেখা নেই, তাই সে ছুটল কানাইয়ের মায়ের উদ্দেশ্যে,যেখানে শশীবালা প্রায়ই যায়।

শশীবালা ধানভানার কাজ করছিল। হঠাৎ ভুলু দৌড়ে এসে শশীবালার কাপড়ের আঁচলটা কামড়ে ধরে টানতে লাগল, আর অব্যক্ত ভাষায়-কুঁই কুঁই শব্দ করে ডাকতে লাগল ! শশীবালা বিস্ময়ে হতবাক। আদর করে ডাকল-' ভুলু কি হয়েছে রে ?' ভুলুর কোন উত্তর নেই।

সেই কুঁই কুঁই করছে আর কাপড় ধরে টানছে। শশীবালার সঙ্গে যারা ধান ভানছিল তারাও অবাক হল। বলল- 'হয় তো কিছু হয়েছে। শমী চলতো গিয়ে দেখি।'

শশীশলার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে দেখল-কই কানাইতো আসেনি। সে ভুলুকে জিজ্ঞেস করল- 'কানাই কোথা রে ভুলু ? হায় ! ভুলু শুধু সেই করুণ সুরে কুঁই কুঁই করে ছুটল রাস্তার দিকে। তার পিছনে ছুটল শশীকালা, 'কানাই কানাই বলে ডাকতে ডাকতে। পাড়ার লোকেরাও ছুটল পিছনে। ভুলু সেই পুকুর পাড়ে এসে খোঁড়া জায়গাটা আঁচড়াতে লাগল, আর কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল। পাড়ার লোকেরা বুঝল-একটা কিছু হয়েছে। সবাই মিলে মাটি খুঁড়ে সরিয়ে ফেলল যখন, দেখা গেল-কানাই সেই গর্তের মধ্যে পাথরের মুর্তির মত বসে আছে নিস্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে। মনে হচ্ছিল তার ঠোঁট দুটো তখনও কাঁপছে।

শশীবালা চিৎকার করে উঠল- 'কানাই- বাবা আমার।.... কোন উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু কানাইয়ের দেহটা একটু কেঁপে একপাশে হেলে পড়ল। যেন মায়ের কাছে যাওয়ার অন্তিম প্রচেষ্টা ! পাড়ার লোকেরা কানাইকে গর্ত থেকে তুলে এনে চোখে মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। মনে হলো তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। কয়েক মিনিটের মধ্যে অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে তার চেতনা যেন একটু একটু করে ফিরে আসছিল ঈশ্বরের আর্শীবাদে। তবে অত্যন্ত ক্ষীণ ; অত্যন্ত দুর্বল। একটু দুধ খাওয়ান হল তাকে।

প্রায় ঘন্টাপানেক বাদে কানাই তাকালো সামনের দিকে। তারখানিকটা দুরেই তার মাকে সে শুয়ে থাকতে দেখল। তার মনে হলো- মা কেন শুয়ে আছে। সে মৃদুস্বরে বলল- 'মা, মায়ের কি হয়েছে ? এই ভয়ঙ্কর ঘটনার অভিঘাতে শশীবালা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারও অবচেতন মনের কিনারা ধরে কে যেন নাড়া দিল এই শব্দ বন্ধ মা, মায়ের কি হয়েছে ? ... শশীবালা পাশ ফিরে চোখ মেলে চাইল আকাশের দিকে ।একটু ওঠবার চেষ্টা করল, উঠলও একটু। দেখল একটু দূরে কানাই চেয়ে আছে অবাক দৃষ্টিতে।

শশীবালা সমস্ত শক্তিকে একত্র করে ডাকল- 'কানাই, বাবা আমার।' কিন্তু একটা ক্ষীণ শব্দই তার মুখ থেকে বের হল- কানাই।' কানাই কোন গতিকে হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের কোলে এসে ঢলে পড়ল। পাড়ার লোকেদের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল আনন্দাশ্রু। ওদিকে একটু দুরে বিন্দে পিসি দরজার আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে ছিল আর থর থর করে কাঁপছিল,ভাবছিল আজ আর তার রক্ষা নেই !!

পদ্মকলি

গোপালী গঙ্গোপাধ্যায়

'পদ্মকলি রায়'-- মাস্টারমশাই ডাকলেন। বললেন- 'এবার পূজার ১০৮টি পদ্মফুল তোমাকে দিতে হবে, পারবে তো ? পদ্মকলি উত্তর দেয়-পাড়ব, মাস্টামশাই।

প্রতি বছরই পুজোর জন্য ফুল সেই এনে দেয়। বাড়ির একটু দূরে, সামনেই বড় দিঘি, অজস্র পদ্মফুল। তাই তাকে ফুলের কথা ভাবতেই হয় না। পুজোর কয়েক দিন আগেই স্কুলের ছুটি পড়ে যায়। আনন্দে সবার প্রাণে খুশির ঢেউ খেলে যায়। ছোট্ট গ্রাম। একটি মাত্র পুজো। পুজো মন্ডপের অভাবে, এই স্কুলের বারান্দাতেই মঞ্চ তৈরি করে পুজো হয়।

পুজোর দু-একদিন আগে থেকেই ফুল তোলা শুরু হয়ে যায়।অনেক দূর থেকে লোকেরা এসে ফুল নিয়ে যায়। পঞ্চমীর দিন সকাল

বেলা পদ্মকলির ফুল তোলা শুরু হয়েছে। এমন সময় মধ্য বয়সি এক মহিলাও এসেছে ফুল তুলতে।সে নাকি অনেক দিন থেকেই ফুল তোলার কাজ করছে। তার স্বামীও এই কাজ করেছ। বছর পনের হলো স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই তার উপরেই এসেছে বিভিন্ন পুজোয় ফুল দেওয়ার কাজ। মহিলার আশ্বিন মাস এলেই মনে পড়ে আর এক আশ্বিনের সেই দুর্যোগের কথা।

সেদিনও ছিল মহা দুর্যোগ ভরা আশ্বিনের দুর্গা পুজোর সময়। আসন্ন প্রসবা সদ্য বিধবা দেবকী, স্বামীর কাজের ভার নিয়ে এসেছে ফুলের সন্ধানে। শরতের নির্মল আকাশ, কালো মেখে ঢাকা। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ আর চলতে পারে না।সে তাই নিকটস্থ একটি গাছের নিচে বসে পড়ে।দেখতে পায় পাশেই রয়েছে বেশ বড়ো এক দিঘি অজস্র পদ্মফুলে ভরা। কিন্তু অসহ্য প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে স ছটফট করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক সন্তানের জন্ম দিয়ে সে অচৈতন্য হয়ে যায়।

তখনও সন্ধ্যা নামেনি। নির্জন এই বন পথে লোকজনের চলাচল খুব কম। পাশের গাঁয়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামকুমার রায়, একটু সটকাট ভেবে বাজার থেকে ফিরছিলেন এই পথ দিয়ে। সদ্যজাত শিশুর কান্না শুনে, সন্তানহীন রামকুমার চমকে গেলেন।এগিয়ে গিয়ে দেখেন, গাছের তলায় সেই অভাননীয় দৃশ্য। মহিলার ক্ষীণ দেহে চৈতন্যের লেশমাত্র নেই। অগত্যা রামকুমার শিশুটিকে নিয়ে বাড়ি এসে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। পুত্রহীনা স্ত্রী আনন্দে চোখের জল ফেলতে থাকল। ভগবানের দান মনে করে তারা কন্যা শিশুটিকে লালন পালন করতে লাগল।

এদিকে প্রসবান্তে জীর্ণ শীর্ণ দেবকীর দেহে চেতনা এলো যখন ভোরের আলো ফুটছে পূর্বের আকাশে। কিন্তু তার সদ্যজাত সন্তানকে অনেক খুঁজেও দেখতে না পেয়ে হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলো।হায় ! সে বছর পুজোর ফুল তোলা তার হোল না। পরের বছর সে এলো সেই পুকুরে ফুল তুলতে।সন্তান হারা মা, পুজোর ফুল তুলে চোখের জলের অঞ্জলিতে পুজোর ফুল যোগান দিল।এই অতৃপ্ততা নিয়েই তার কেটে যায় বছরের পর বছর।একই পথে, একই পুকুরে প্রত্যেক বারই সে ফুল তুলতে যায়। এছাড়া অন্য কোন পুকুরে অতো ফুলও ফোটে না। তাই এবারেও তাকে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজ, এই মেয়েটির মুখ দেখে দেবকীর মনে পড়ে গেল তার স্বামীর মুখের প্রতিচ্ছবি। নিজেকে সংযত করে দেবকী মেয়েটিকে বলল-'তোমার নাম কি মা ? ' মেয়েটি বলল- 'পদ্মকলি রায়'। দেবকী আবার জিজ্ঞেস করল 'কে কে আছে তোমার?' পদ্মকলি বলল 'বাবা আছে।' দেবকী আবার বলল- 'মা?' পদ্মকলি বলল- 'মা মারা গেছে দু বছর আগে।

অজানা এক দুঃখে-সুখে কেঁপে উঠল দেবকীর বুক।কে তার মা-বাবা।তবু আবার একবার দেবকী জিজ্ঞেস করলো- 'তুমি কোথায় থাকো মা ?' একটু দূরে গাঁয়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পদ্মকলি তাদের বাড়ির দিকে। দুজনের ফুল তোলা হয়ে যায়। পদ্মকলি ফিরে যায় তার বাড়ির দিকে। দেবকীও ফিরে আসে তার বাড়িতে। কিন্তু কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না-সেই মুখ।সত্যই সদ্যফোটা একটি পদ্ম, নির্মল নিষ্পাপ।

পুজোর পর, দেবকী সেই পথে এসে হাজির হয় পদ্মকলিদের ছোট্ট কুটিরে। পদ্মকলি সেদিন অসুস্থ বাবার সেবায় ব্যস্ত ।তারপর আবার তাকে স্কুলে যেতে হবে। রামকুমার দাওয়ায় বসে বসে ভাবে পিতৃ মাতৃহীন মেয়ের কথা। ওর মা কি চৈতন্য ফিরে পেয়েছিল ? নানা প্রশ্নের জাল বুনে চলেছে সে মনের মধ্যে। এমন সময় দেবকী এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। অল্প বয়সী দেবকীকে দেখে অবাক হয়ে রামকুমার প্রশ্ন করে,'তুমি কে মা ? কি জন্যে এসেছো?'

তখন দেবকী তার পরিচয় ও অতীত ঘটনা সমস্ত খুলে বলতে লাগল। রামকুমার আশ্চর্য হয়ে দুঃখে ও আনন্দে বলল- 'হ্যাঁ মা, তোমায় নিষ্প্রান দেখে আর সদ্যজাত শিশুটির কান্নায় ব্যাকুল হয়ে ওকে নিয়ে এসেছিলাম। সেই শিশুকন্যাই এঐ পদ্মকলি। আমার পরিচয়েই ওর পরিচয়। যাক্ তোমার হারানো কন্যা তোমাকেই দিলাম ক্ষ্ম... বৃদ্ধ রামকুমারের দুচোখ বেয়ে নেমে আসছিল অশ্রুধারা। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ রামকুমার আর একবার অনুভব করছিল সন্তানহীন নিঃসঙ্গ জীবন।

অনুগল্প

মৃতের বিড়ম্বনা

পার্থ পাল

স্বামী দিব্যানন্দ আর নেই। তিনি এখন বিদেহী। খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা এলাকায়। হবে নাই বা কেন, তিনি যে এই গ্রাম্য এলাকায় বড্ড জনপ্রিয়। তিনি আমার শিক্ষকও। ওনার কাছে ইংরেজি পড়েছি আমার স্কুলবেলায়। তাই শ্রদ্ধা,আবেগ ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে এক অদ্ভুত টানে রওনা দিলাম স্বামীজীর বাড়ির দিকে।

যদিও বাড়িটি ওনার নয়। ওনার মায়ের। নিজের

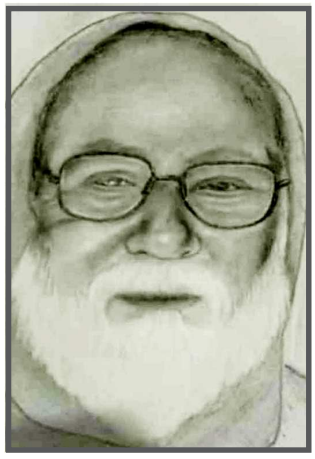

মা নয় ; পাতানো মা। আজ থেকে বছর পনেরো আগে হঠাৎ করে স্বামীজি এ এলাকায় এসে হাজির হন। পাঁচ ফুট উচ্চতার বেটেখাটো, শক্তপোক্ত মানুষটির উর্ধাঙ্গে কাপড় নেই ; খালি গা। নিচের অংশে একটি সাদা কাপড় ভাঁজ করে লুঙ্গির মত করে পড়া। পায়ে কাঠের তৈরি খড়ম। মাঠে কাজ করতে থাকা একদল মহিলার সামনে গিয়ে এক মহিলাকে প্রস্তাব দেন, '' মা, আমি তোর ঘরে থাকতে চাই। থাকতে দিবি? '' রেবা নামের মাঝবয়সী বিধবা সেই মহিলাটি এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যান। কিন্তু কি আশ্চর্য! মানুষটিকে দেখে,জরিপ করে তিনি রাজিও হয়ে যান। সেই থেকে শুরু হয় মা বেটার একসঙ্গে থাকা। রেবার একমাত্র মেয়ে বিয়ে করে অন্যত্র সংসারী। তার ছেলে এসে থাকে এই দিদার কাছে।

দিব্যানন্দ পেশা হিসেবে গৃহ-শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। উনি ওনার এভাবে উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় করতেন সমাজসেবায়। দরিদ্র পড়ুয়াদের বই,খাতা, জামাকাপড় কিনে দেওয়া বা অভাবী মানুষের মেয়ের বিয়ের খরচে যথাসাধ্য সাহায্য করার মতো কাজে উনি পিছপা হতেন না কখনও। তাই এলাকার আপামর মানুষ তাকে ভালোবাসতেন গুরুর সম্মানে।

ইদানিং বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না শুনেছি। আজ এই মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হলাম। ডোমপাড়া পৌঁছে দেখি, লোকে লোকারণ্য। 'সাধুবাবা'-কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন সকলে। দেখলাম এই পনেরো বছরেই স্বামীজি তাঁর মায়ের কাঁচা বাড়িটিকে দু-কামরার পাকা বাড়িতে সাজিয়ে দিয়েছেন। সামনে আছে এক চিলতে উঠানও। সেখানেই হরিনামের দল হরিনাম করছে। সবই চলছে স্বামীজীর লিখে যাওয়া নির্দেশ মতো। নির্দেশে আরও কি আছে জানার আগ্রহ হলো। ডায়েরির পাতায় দেখলাম লিখেছেন, ''আমার শরীরকে দাহ নয় ; কবর দিও। মৃতদেহকে শায়িত অবস্থায় না রেখে যোগমুদ্রায় রেখো। '' স্বামীজীর 'মা' রেবাদেবী এখন তাঁর বাড়ির উঠানটিকে কবর হিসাবে ব্যবহার করতে রাজি হলেন না। সকলে চাপা স্বরে তাঁর সমালোচনা শুরু করলেন। বিপদ বুঝে রেবাদেবী প্রতিবেশীর বাড়িতে গা ঢাকা দিলেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে যাচ্ছে দেখে ভক্তদের গুঞ্জন ক্রমে কলরবে পরিণত হলো। তখনই একটা আশাপ্রদ প্রস্তাব এল। শরমপাড়ার সুদীপ বলল, তার বাড়ির উঠানটা বেশ বড়। তারই এক কোণে স্বামীজীর কবর দেওয়ার অনুমতি পেলে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। বাকিরা সমস্বরে তৎক্ষণাৎ সে অনুমতি দিলেন। সে বাড়িতে ফোন করে উচ্ছসিত গলায় তাঁর এই ভাগ্যদয়ের কথা জানাতে লাগল। কিন্তু..., ও প্রান্ত থেকে তীব্র প্রতিবাদ ও তর্জন গর্জনে সে মিইয়ে গেল জল দেওয়া মুড়ির মতো।

ব্যাপারটা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে গ্রামের এক মাতব্বর খালপাড়ে বাঁশবাগানের সন্ধান দিলেন। স্বামীজিকে ওই বাঁশবাগানে কবর দিলে সমস্যার আপাত সমাধান হবে বলে তাঁর মত। কথা মত কাজ শুরু হলো। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। তাই জোরালো হ্যালোজেন আলোর ব্যবস্থা হল। শুরু হলো মাটি খোঁড়ার কাজও। মাটি খোঁড়া শেষ হলে মৃতদেহ স্থাপনে দেখা গেল ভয়ংকর গন্ডগোল!! দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকায় তাতে ন্যূনতম নমনীয়তাটুকুও অবস্থিত নেই। সেটিকে এখন যোগমুদ্রায় বসানো হবে কিভাবে! এগিয়ে এলেন সেই ডাকাবুকো মাতব্বরটিই। তাঁর নির্দেশ মতো কুড়ুল, হাতুড়ি, কাটারি এসে হাজির হলো।

আমার আর সহ্য করার ক্ষমতা নেই বুঝে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

গরিবীয়ানার দোষ

মায়া সাহা

শেফালী আজ কাজের বাড়িতে ওর দশ বছরের ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা অসুস্থ বলে ও আজ স্কুলে যেতে পারেনি। ওদিকে ওর স্বামী প্রতিদিন দুপুরে মদ্যপান করে ঘরে ঢোকে । সেই ভয়ে ছেলেটাকে বৃদ্ধা শাশুড়ির কাছেও রেখে আসতে ও সাহস পায়নি।

ও তাড়াতাড়ি করে সমস্ত কাজ সেরে, দুপুরের খাবারটা গুছিয়ে ব্যাগে ভরে,অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে ফেরে।

পরেরদিন শেফালী কাজে এলে প্রদীপ বাবু ওকে বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করলেন। তিনি বলেন, ''তোমাকে আর আমার বাড়িতে কাজ করতে হবে না।'' ও কারণ জানতে চাইলে প্রদীপবাবু বলেন, ''তোমার ছেলে তো একটা পাকা চোর ! এভাবে আমার পকেট থেকে টাকা চুরি করার সাহস হয় কি করে ? ও'কে তুমি শিখিয়ে এনেছিলে বুঝি ? ''

একথা শুনে শেফালী হতবাক্।ওর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। ও কাঁদতে কাঁদতে বলে, ''বাবু আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আমার ছেলে এমন নয়। ওকে আমাদের পাড়ার সবাই ভালোবাসে। এইতো সেদিন মদন মিত্তিরের দোকানে এক ভদ্রলোক মানিব্যাগ ফেলে চলে যাচ্ছিল। আমার ছেলের চোখে পড়তেই ও ছুটে গিয়ে ব্যাগটা ওনাকে ফেরত দিল। ভদ্রলোক খুশি হয়ে ওকে পাঁচশত টাকা দিতে চাইল। কিন্তু আমার ছেলে সেই টাকা নেয়নি। এমন লোভী হওয়ার শিক্ষা আমার ছেলেকে দিইনি গো বাবু..... !!''

এমন সময় প্রদীপ বাবুর ফোনে রিং বাজতে লাগল। ফোন রিসিভ করতেই স্কুলের প্রিন্সিপালের নালিশ,

''আপনার ছেলে লালটুকে দুর্নীতির কারণে আমরা সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নিলাম। গতকাল স্কুল ছুটির পর ও স্কুলের পেছনের গ্রাউণ্ডে গিয়ে জুয়া খেলে বিকাল পযর্ন্ত মদ্যপ অবস্থায় পড়েছিল।

এলাকার মানুষ ওদের কুকর্মের ভিডিও করে

আমাকে পাঠিয়েছে। এমন দুর্নীতিমূলক কাজ ও আগেও করেছে।এতে আমাদের স্কুলের বদনাম হচ্ছে।''

প্রদীপবাবু হতবাক। বুঝলেন, কাল রাতে যখন টাকার খোঁজ পড়েছিল, লালটু কেন শেফালীর ছেলের দিকে সন্দেহের তির ছুঁড়ে মারছিল।

আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে শেফালী। আমার ছেলের এতো অধঃপতন হয়েছে, আমি জানতাম না গো ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

বাবু, দোষটা তোমার না গো। দোষটা আমাদের গরিবীয়ানার.....তবে ওই যে ভগবান বলে তো একজন আছেন। বিশ্বাস করি,তিনি সময় মতো সব অন্যায়ের হিসাব চোখের সামনে তুলে ধরেন।

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই —

গুড়বাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

মানবিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সার্বিক উন্নতি সাধনই আমাদের লক্ষ্য।
'কন্যাশ্রী'র সাফল্যে উদ্ভাসিত আমরা । নির্মল পঞ্চায়েত ও পানীয় জলের নিরাপদ সুরক্ষা প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য।
'শিক্ষাশ্রী', 'রূপশ্রী' ও 'মানবিক' প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা সুনিশ্চিত করা আমাদের একান্ত কাম্য।
'কৃষক বন্ধু' ও 'খাদ্য সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে স্বনির্ভরতা প্রদান আমাদের লক্ষ্য।

সুভাষ টুডু
উপ প্রধান

অসীমা ধাড়া
প্রধান

মানবতা

পার্থসারথি মহাপাত্র

হন্তদন্ত হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে হরিপদ দেখল সামনেই একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

-'এই স্টেশন যাবি?'

- 'হঁ বাবু, চাপুন।'

সম্মতি পেতেই হরিপদ চেপে পড়ল। রিক্সাওয়ালাকে বলল, 'তাড়াতাড়ি চালা ট্রেনটার সময় হয়ে গেছে।' নিজে নিজেই বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল, বাপরে বাপ! বেকার প্রমোশন নিয়ে এখানে এলাম। টিফিনটা পর্যন্ত খাওয়া হল না। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ধমকের সুরে বলে উঠলো, 'আরে কি হল জোরে চালা।'

রিক্সাওয়ালা সাধ্য মত চেষ্টা করছে, কিন্তু খালি পেটে আর জোর পাচ্ছে না। সূর্য অস্ত প্রায়।

অবশেষে তারা স্টেশন পৌঁছাল। এদিকে মাইকে ঘোষণা হয়ে গেল, 'পুরুলিয়া আসানসোল লোকাল তিন নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ছে।'

-'যাহ্! আর হল না। তোর জন্য লোকালটা মিস করলাম।' আসার জন্য যত তাড়া ছিল এখন ভাড়া দেওয়ার সময় ততটাই মন্থর হয়ে গেল হরিপদ। দশ টাকার একটি ময়লা নোট বেছে রিক্সারওয়ালাকে দিল।

- 'বাবু, আর দেন।'

- 'দিতাম, ট্রেনটা ধরাতে পারলি কই?'

প্রৌঢ় রিকসাওয়ালা আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহকে কিছু বলে ওপাশের নলকূপের দিকে গিয়ে হাতল নেড়ে চোখে মুখে জল নিচ্ছিল।

হরিপদ তখনও ভেতরে যায়নি। এটা দেখে হঠাৎ যেন ওর মানবতা জেগে উঠলো। এটা রমজান মাস। ছুটে গিয়ে নলকূপের হাতল নেড়ে দিল হরিপদ। -'স্যরি, কিছু মনে করবেন না, আমি বুঝতে পারিনি আপনি রোজা রেখেছেন। না না শুধু জল পান করবেন না হাত পা ধুয়ে নিন।' তারপর টিফিন বক্স থেকে কয়েকটা খেজুর ও আপেল রিকসাওয়ালার হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো ইফতার হিসাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।'

একমেবাদ্বিতীয়ম

ছন্দা দাম

বাড়িতে আবহাওয়া উত্তপ্ত, একমাত্র ছেলের বৌ নার্সিং হোমে। সবাই দুশ্চিন্তায় এবারো কি কণ্যাসন্তান!!

উর্মিমালার একটা তিন বছরের মেয়ে আছে, দুনম্বর বারও মেয়ে মৃত জন্ম নিয়েছিল বলে সবাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। এবার সবাই যেন অলিখিত চুক্তিপত্র সাক্ষর করিয়েই ওকে পাঠিয়েছিল।

পলসায়েন্স এমএ উর্মির বাবা মেয়েকে বিয়ের সময় অভয় দিয়েছিলেন...মা রে বাপের ঘরে বড় কষ্টে পড়াশোনা করেছিস, সংসার ও চালিয়েছিস টিউশন করে। ধনীর ঘরে যাচ্ছিস সুখ ফিরবে তোর।

হ্যাঁ সুখ বলতে যা চাই সবই ছিল। কিন্তু সুশিক্ষিতা উর্মি প্রথম দিনেই বুঝে গেছিল ও একটা সোনার খাঁচার বন্দী।শাশুড়ি বলছিলেন...বৌমা তুমি আমার বংশকে এগিয়ে নেবে,আর রায় বংশের কানুন শিরোধার্য রাখবে এইটুকুই চাই ।

তিন বছরের মেয়েটাকে নিজের মতো মানুষ করার স্বপ্ন দেখার অধিকার ওর ছিল না, প্রতিমুহূর্ত মাথায় খাড়া ঝুলছে পুত্রসন্তান চাই।

বৈশাখী ঝড় হচ্ছে,আজ বাড়ি থেকে এখনো কেউ আসতে পারে নি। পুরো হসপিটাল ঘুমিয়ে আছে,চেয়ারে বসা ঘুমন্ত নার্সের পাশ দিয়ে ধীরে বেরিয়ে আসল উর্মি।ঝড়টাই জীবন বদলাবে ওর। সামনে রাখা এমবেসেডরের ডিকিতে সন্দর্পনে উঠে পড়ল।গাড়ি চলতে শুরু করল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ মনে হল গাড়ি থেমেছে। উঁকি দিয়ে দেখল আশ্রম। নেমে পড়ল ধীরে।

পরদিন ভোরে মন্দিরের সিড়ি থেকে সদ্যোজাত মা ও মেয়েকে আবিষ্কার করলেন পূজারী।দুদিন মন্দিরে থেকে উর্মি বেরিয়ে পড়লো অনির্দিষ্টের পথে।মেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব সে একাই নেবে।

বংশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে দেশের সমৃদ্ধিতে যোগদান করার স্বপ্ন তার দুচোখে ভেসে উঠেছিল।

গাধাতন্ত্র

মাখনলাল প্রধান

ঘোড়া ছুটতে ছুটতে গাধা পল্লীতে এসে বলল - পশুরাজ থুড়ি মহারাজ বলেছেন,গাধারা বড্ড বোকা।গাধারা সারাজীবন বোঝা বয়ে মরে। ওদের জন্য দুঃখ হয়।

শুনে গাধা শিরোমণি চিৎকার দিয়ে বলে উঠল - বলে দিও, গাধারা যা পারে তা আর কেউ পারে না।

ঘোড়া বলল - তবে নিজেরা মারামারি করা কি ভাল?

গাধা বলল - তোমরা বোঝ কম।মারামারি করি না খেলা করি।যারা খেলতে জানে না তারা ওই রকম উদ্ভট মন্তব্য করে।খেলা মানে প্রতিযোগিতা। সেখানে একটু গুঁতোগুঁতি, অঙ্গহানি,দু'একটা না মানে অঘটন ঘটবেই।

ঘোড়া চলে গেল।কয়দিন পর আবার এক বার্তা নিয়ে ঘোড়া এল।গাধারা তখন রীতিমতো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার কথা কেউ শুনছেই না। অনেক কষ্টে এক বৃদ্ধ গাধাকে পাকড়াও করে জানাল - মহারাজ বলেছেন,গাধারা আইন শৃঙ্খলা জানে না,মানে না,বড্ড বেয়াদব।

শুনে বৃদ্ধ গাধা লাফিয়ে চেঁচিয়ে তর্জন গর্জন করে উঠল - আমাদের আদব-কায়দা উনারা কী বুঝবেন ! আমরা শিক্ষিত এবং গাধাতন্ত্রপ্রিয় জাতি। গাধাতন্ত্রে সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তাই গাধারা তাদের জাতির সকলের কথা বলে।বোকারা কিস্ সু বোঝে না।ওরা তো স্বৈরতন্ত্রে বাস করে।থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে আর আমাদের দেখে শিখতে তো পারে না। নিজেদের দাসত্বের বীজ ছড়াতে চায়।

ঘোড়া জানতে চাইল - গাধাতন্ত্র কী ভাই ?

বৃদ্ধ গাধা বলল - তোমরা কি এসব বুঝবে ? গাধাতন্ত্র হল নিম্নতন গাধাদের জন্য ঊর্ধ্বতন

গাধাদের দ্বারা লাভ লোকশান ভাগবাঁটোয়ারা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে অন্য সবাইকে চোখ রাঙানো,কেশ দেওয়া, হিসেবে গড়বিড় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোড়া বলল - বাপের জন্মে শুনিনি এমন কথা। যাই,মহারাজকে একথাই বলে দেব।

বৃদ্ধ গাধা হাসতে হাসতে বলল - যাও যাও, মহারাজকে বলগে যাও শীঘ্রই গাধাতন্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করব আমরা। সকলেই আমাদের গাধাতন্ত্রে যোগদান করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

হড়পা বান

চন্দ্রানী মজুমদার

ত্রিদিব ও সুতপার বহু বছরের প্রেম পরিণতি পেতে চলেছে, এই বছর শারদ উৎসবের পূর্বেই তাদের বিয়েটা ফিক্স হয়ে গেলো,আগামী ডিসেম্বরে বিয়ে।তাইতো দুই বাড়িতে এখন উৎসবের আমেজ, বিয়ের প্রস্তুতি পর্বও শুরু হয়ে গেছে টুকটাক। এরই মাঝে দুর্গাপুজোতে ত্রিদিব ও সুতপা একসাথে ঠাকুর দেখতে বেরোলো অষ্টমী ও নবমীতে এবং খুব আনন্দ উপভোগ করলো। আর কিছুদিন বাদেই তাদের শুভ পরিণয়, তাই তাদের প্রেম এখন টান টান উত্তেজনার। অবশেষে এলো বিজয়া দশমী, আজকে দূর্গা মায়ের ঘরে ফেরার দিন, তাই সকলের মন ভারাক্রান্ত। বাড়ির কাছেই ইছামতি নদীতে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন হয় প্রতি বছর, ত্রিদিব প্রতিবারেই সেখানে উপস্থিত থাকে। কিন্তু এই বছর সুতপাও জেদ চেপে বসলো ইছামতি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যাবে বলে। তাই দুজনে একসাথেই বেরিয়ে পড়লো সন্ধ্যের পরে, সেই সন্ধ্যায় নদীতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়, অনেকেই নৌকায় করে বিসর্জন দেখতে যান। ত্রিদিব ও সুতপাও চেপে বসলো একটি নৌকায়, নদীর মাঝখানে গিয়ে বিসর্জন দেখবে বলে। কিন্তু বিপদ তো আর কোনোদিন বলে কয়ে আসে না, ত্রিদিব ও সুতপার জীবনেও সেদিন বিপদ ঘনিয়ে এলো। ইছামতি নদীতে এলো হড়পা বান, নদীতে ডুবে গেলো ৩ টি নৌকা, যার একটির মধ্যে ত্রিদিবরা ছিল। ৩ টি নৌকা থেকে প্রায় ১৭ জন নদীতে তলিয়ে গেলো, ৫ জনকে পরে উদ্ধার করা গেলেও ত্রিদিব বা সুতপাদের কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এভাবেই চির অন্ধকারে হারিয়ে গেলো একটি প্রেমিক যুগল, অসমাপ্তই রয়ে গেলো তাদের ভালোবাসা। হড়পা বান কতটা সর্বনাশা..!

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

সন্দীপ যাযাবর দত্ত

- আসুন, পেটে কিছু দিই। সেই সক্কাল থেকে ....

- আমি তো আবার বাইরে কিছু খাই না। আসুন না, যা সঙ্গে আছে, তাতে দুজনেরই .....

কথা হচ্ছিল বীরেন মান্না ও কেশব মাপারুর। গোপনগড় সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকানে বসে।

- না, না! আপনি খান। আমি বরং কিছু একটা কিনে.....

- ছাড়ুন তো! তেমন কিছু নেই! সামান্য একটু মুড়ি আর সঙ্গে অল্প খানিকটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। নিন, নিন।

কেশব বাবু ব্যাগের চেন খুলে একটু স্যানিটাইজার হাতে নিলেন, বীরেন বাবুকেও দিলেন।

- মুড়ি ঠিক আছে কিন্তু ওই ফ্রেঞ্চ ..... কি যেন একটা খওই জিনিস তো আমি মানে.....

- আরে ও কিছু না। চেখেই দেখুন না।

কেশববাবু টিফিন কৌটো খোলায় মন দিলেন। প্রসঙ্গ পাল্টে বীরেন বাবু বলেন, -

- ভাবুন তো! একটা টেস্টের জন্য এই নিয়ে তিন দিন এলাম। আজ টেকনিসিয়ান নেই, তো কাল মেসিন খারাপ, কিম্বা আজ তো ওই টেস্ট হয়না। এই শরীরে কাঁহাতক আর ছুটোছুটি করি বলুন তো!

- আমারও তো ওই একই হাল। রিপোর্ট যদিও করালাম, ডাক্তারের আর দেখা পাওয়া যায় না! দেখা যদিও পেলাম, সময় নেই, বেরিয়ে গেলেন। আজ একজন বলল, উনি ছুটিতে আছেন।

- তবুও নাকি সুপার স্পেসালিটি হাসপাতাল ! এর চেয়ে রুরাল হসপিটালই তো ভালো ছিল মশাই!

কেশব বাবু মুচকি হেসে টিফিন কৌটো এগিয়ে দিয়ে বললেন,

- নিন নিন, দুটো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে শুরু করুন!

কৌতূহল চেপে বীরেন বাবু হাত বাড়িয়েই অবাক হলেন। বিস্ময় আড়াল না করেই বললেন,

- আরে এ তো দেখছি মুচমুচে আলুভাজা!

- হুম! সুপার স্পেসালিটি হলে মুচমুচে আলুভাজাকেই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বলে। কিম্বা পেঁয়াজ ভাজাকে বেরেস্তা! বুঝলেন কিছু?

সরি স্যার

প্রশান্ত গিরি

অনলাইনে প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী অর্ডার করে স্ত্রীকে বললাম

রান্না চাপিয়ে দাও, পনেরো মিনিটে ডেলিভারী দিয়ে দেবে,

আজ পয়লা মে, ছুটির দিনে কোথাও বেরোবো নেই উপায়, বাইরে উত্তাপ তেতাল্লিশ ডিগ্রী ছুঁয়েছে, ছেলে কুচুনের স্কুল ছুটি, ও একা একা ড্রয়িং বুকে ইচ্ছে মতো রং ভরছে। পাশে বসে তাই দেখছি,একটা সূর্য এঁকেছে

লাল টকটকে, সিলিং ফ্যান ঘুরছে বটে কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই, প্রাণ থাকলে বলেই ফেলতো ''কেনো বৃথা ঘোরাও আমায় ?'' পেরিয়ে গেলো, ক্ষ্মকি গো...ডেলিভারী কই ?ক্ষ্ম

সত্যি বটে, এমন তো হয়না ! ট্রাক করতে দেখাচ্ছে, এরাইভড !

মিনিট দুই পরে কলিং বেল বাজলো ঊ কুচুন ছুট্টে গিয়ে দরজা খুল্লো,

''সরি স্যার ! একটু দেরি হয়ে গেল, আসলে এড্রেসটা খুঁজে পেতে... ''

মনে মনে বিরক্ত আমি বললাম ক্ষ্মসবাই এই অজুহাত দেয়, দেরি হোক আপত্তি নেই,

কিন্তু মিথ্যে না বললেই নয় ?

ছেলেটি মুখ নিচু করে কাচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ঘরে ঢুকলাম

টাকার জন্য ।

'' বাবা, ইটস ব্লিডিং ! আঙ্কেলের মাথায় রক্ত! ''

ফিরে দেখলাম সত্যি তো, আমি খেয়াল করিনি,

''আরে তুমি ভিতরে এসো ভাই, বসো জল খাও''

''নাহঃ ঠিক আছে স্যার, ও কিছু না, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওই পিছনের সরু গলিতে

একটি রডে খোঁচা লেগে গেলোধ্ব।''

বছর একুশের ছেলেটির চোখে আর চোখ মেলাতে পারলাম না, স্ত্রী কে বললাম ''একটু তুলো আর এন্টিসেপ্টিক আনো তো।''

পরিনতি

জিনিয়া কর

বিজনেস টাইকুন প্রদ্যুতবাবু বেলা শেষের দিন গুনছিলেন কয়েক বছর ধরেই। তার তিন ছেলে এক মেয়ে তারই জীবদ্দশায় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আদালতের পথে। অবহেলায় অনাদরে প্রিয়তমা পত্নীও ওপারের ভেলা ভাসিয়ে মুক্তি পেয়েছেন কিছুকাল আগেই।

যেকোনো সময় জোর জবরদস্তি সম্পত্তি লিখিয়ে নেবে ছেলে মেয়েরা, এই ভয়ে ভাবনায় প্রদ্যুত বাবুর রাত কাটে অনিদ্রায়।

একসময় বিশাল অট্টালিকার প্রত্যেকটি কোণ কে আভিজাত্যের অলংকারে মুড়ে উত্তরণের পথে সাফল্যের স্বাদ নিয়ে ভেবেছিলেন, সুখ তার গোলাম.....

কিন্তু আজকাল খুব মনে হয় সুখের প্রসাদে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে জীবন তিনি যাপন করেছিলেন একসময় তাতে সত্যের অপলাপ ছিল বিস্তর। আর তাই হয়তো অহম কে জয় করা যায়নি। ফলস্বরূপ আজ তার উত্তরসূরীরা স্বার্থের সংঘাতে মত্ত। তিনিই আজ সংসারে বাহুল্য।

মরনের ফুল ফোটে জীবনের উদ্যানে। বিষয় বিষের জ্বালায় নীল হতে হতে একদিন প্রদ্যোত বাবু জীবন সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেলেন মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে তারই সন্তানেরা।

এসো হে বৈশাখ

সুজয় সাহা

১ লা বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ। দিনটি সকল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণের দিন। দিনটি বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি বাংলার লোকেদের সার্বজনীন লোকোৎসব হিসেবে হিসেবে বিবেচিত। পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়েছিল পুরাতন ঢাকার মুসলিম মাহিফরাস সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। সৌর পঞ্জিকা অনুযায়ী বাংলা বারো মাস অনেক কাল আগে থেকেই পালিত হতো। এই সৌর পঞ্জিকার শুরু হতো গ্‌গেরীয় পঞ্জিকায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। সৌর বছরের প্রথম দিন অসম, বঙ্গ, কেরালা, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনেক আগে থেকেই পালিত হতো। এখানে যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এমন সময় এমনটা ছিল না। তখনকার মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ, কারণ প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু হওয়া না পর্যন্ত কৃষকদের ঋতুর ওপর নির্ভর করতে হতো। ইতিহাস অনুশীলন করলে জানা যায় যে, আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। কৃষিকাজের সুবিধার্থে মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই মার্চ বাংলা সনের প্রবর্তন হয় এবং তা কার্যকর হয় তার সিংহাসন আরোহণের পর থেকে। হিজরী চান্দ্র সন এবং বাংলা সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন সনটি প্রথমে ত ফসলি মনদ নামে পরিচিত ছিল, পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়।

জোরের কলম

মনোরঞ্জন ঘোষাল

বলল, 'কলমের জোর চাই।'

বুঝলুম সত্যিই তো। ঝরনা কলমে তেমন জোর দেওয়া যায় না। একটু জোর দিলেই নিবখানা ফাঁকা করে কালি ছেরায়।

তাই তাকে সরিয়ে আবার বল কলম হাতে তুলে নিলুম।

তাও হল না। বলল এ কলমেও জোর নাই।

একটু অবাক হলুম! ভাবলুম কলমটিকে একটিবার ভাল করে পরখ করতে হবে।

আমি বেশ ভালো করে দেখলুম। আমার চোখে তার কোন দুর্বলতা ধরা পড়ল না।

ঠিক তখন এক বন্ধু এসে হাজির হল বাড়িতে। সে আমার এমন কলমের প্রতি ভালোবাসার আচরণ দেখে বুঝল, এবার মাথাটি নির্ঘাৎ গেছে।

তাই সে হাসির ছলে জিজ্ঞেস করল, 'ওর ভেতরে মণি মুক্ত লোকানো নেই।'

আমি তখন মুখ ফসকে বলে ফেললুম সত্যি কথা। বললুম, 'কলমে কোথায় দোষ আছে খুঁজছি।'

সে তখনি উত্তর দিল, 'এটি জেল কলম।'

'বল কলম শুনেছিলাম, আবার জেল কলম কী?'

সে ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একখানা প্লাস্টিকের কলম বেব করে হাতে ধরিয়ে দিল।

এবার একটু জোরদিয়ে লিখতে গিয়েই দেলুম, তার মাথা গেল ফেটে। আর সে কলমে তেমন জোর দিয়ে লেখা গেল না।

তাই ভেবে দোকানে গিয়ে একটা লোহার মজবুত কলম কিনে নিয়ে এলাম। বাড়িতে চুম্বক ধরে পরীক্ষা করে বুঝলুম, সত্যিই সেটি লোহার।

তাই দিয়ে বেশ জোরেই লেখা যাচ্ছে। এবার দেখি কী বলে। যদি বলে যে এখনও কলমের জোর কম, তবে সেই কলম দিয়ে একবার মাথায় টকাশ করে মেরে বুঝিয়ে দেবো এই কলমের কত জোর। তখন বুঝতে পারবে কী মোক্ষম কলম এবার ব্যবহার করছি।

সিঁড়ি

বাবলু কাজি

চলতে অক্ষম, না অভিনয় করেনি। সুধাকর নিজের চোখে দেখলো বহু কষ্টে মন্থরগতিতে এসে ট্রেনে উঠলো লোকটা। সুধাকরের পাশেই বসেছেন হরি প্রসাদ ঝা। প্ল্যাটফর্মেই আলাপ। প্রথম আলাপেই উনার তিনটে পেট্রোল পাম্প,ছেলে ও বৌ' মার দুটো প্রাইভেট ইস্কুল, আরো কী কী আছে তা বলে নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছিলেন। বিরক্ত হচ্ছিল সুধাকর। ভিক্ষুক লোকটি নিজের শীর্ণ হাতটি তারই দিকে বাড়িয়ে উপেক্ষা দেখে হরি প্রসাদ জীর দিকে বাড়ায় 'বাবু বহুত ভু'....

'অরে বেটা,ভুখ তো হামারকেও লাগতা হ্যায়, পর মেহনত করকে কামাও, মাঙনা কোই মেহনত নেহি।'

ভিখারি হেসে বললো ' বাবুজি , আপনার গিয়ান সে ভুখ মিট গয়া।'

ও যেতে উদ্যত হতেই হরিপ্রসাদ জী ওকে ডেকে দুটো প্যাঁড়া দিয়ে বললেন 'খাকে পানি পি লেবে।' তারপর পকেট থেকে বটুয়া বের করে বললেন 'ইয়ে দো'শো রুপিয়া রখলে, বাজার সে তিশ পাকিট পাঁচ রুপিয়া ওয়ালি চিপস পাকিট খরিদ,ফির কল আস্মান করকে সাফ কপড়া পোরে ট্রেন মে ওগুলা বেচনা ছ্যায় রুপিয়া কোরে। মগর দো'শো রুপিয়া পুঁজিকো বচাকে রখনা। ফির ধীরে ধীরে পুঁজি বড়্হাবে আউর এক অ্যালুমিনিয়াম কি বালতি খরিদ লেবে। ফির নানা রোকম বিস্কুট,কেক কিনে ট্রেনে বেচবে। এক সাল বাদ হামার দো'শো রুপিয়া ফেরোত দেবে, রাজি।'

ভিখারিটি ওঁকে প্রণাম করে বললো ' ইজ্জত কে সাথ বেঁচে থাকার মওকা দিলেন। আপনি। আমার ভগবান। আশীর্বাদ করুন যেন আমি সফল হই।'

হরিপ্রসাদ একটি কার্ড দিলেন ওকে। লজ্জা পেলাম, প্রথম দিকে বিরক্ত হওয়া এক অবাঙালিকে দুর্বল একজনের জীবনের সিঁড়ি হতে দেখে।

দুর্দশা

মানিক চন্দ্র সৌ

মায়ের আজ ছুটি হবে। হাসপাতালে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। মাকে সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে যাব। খুশিতে মনটা নেচে উঠলো। বিল দেখে খুশি আর রইল না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় সজন সবাইকে টাকার জন্য বললাম। বাকি এক লাখ টাকা হাসপাতালকে দিতে হবে। তবে মাকে ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো । কাছে এই মুহূর্তে লিকুইড মানি নাই। যাদের কাছে চেয়েছিলাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা উত্তর এলো তাতে টাকা পাবার আশা নাই।

টাকা দেয়ার মত আত্মীয় আছে। তাদের কাছেও চাইব না। আত্মমর্যাদা নিয়ে সারাটা জীবন বাঁচতে পারব না। সুযোগ পেলে প্রতি পদে পদে টাকা দেওয়ার খোটা দেবে। যতই আমি অল্প সময়ে ঋণ শোধ করি। অগত্যা বউকে ফোন করলাম।

- হ্যালো।

- মা কেমন আছে? কখন বাড়ি আনবে?

-হাসপাতালে আরও ১ লাখ টাকা দিতে হবে।

- তোমাকে বারবার বলেছিলাম সরকারি হাসপাতালে অপারেশন করাও। তা নয় নামী প্রাইভেট হাসপাতালে গেলে।

--যা হবার হয়েছে। এখন তো মাকে আনতে হবে।

- সারা দুনিয়ার লোক সুস্থ হয়ে বেঁচে ফিরছে। তোমার মা শুধু সরকারি হাসপাতালে মরে যেত।

- কেন বকবক করছো। কিছুতো একটা করতে হবে। তোমার গয়না গুলো বিক্রি কর।

-আমার গয়নাতে চোখ পড়ল। এতদিন বিয়ে হল কটা দিয়েছো? সব তো আমার বাবার দেওয়া গয়না।

- কথা দিচ্ছি , আবার গড়িয়ে দেবো । মাকে বাড়ি নিয়ে যায়।

- তোমার কথার দাম আমার জানা আছে। যেদিন থেকে এ ঘরে ঢুকেছি একটু শান্তি পেয়েছি! হাড়মাস আমার জ্বলে পুড়ে শেষ হলো।

- লক্ষীটি এখন রাগের সময় না। মা হাসপাতালে যতদিন থাকবে বিল বাড়বে। তুমি বাজারে গিয়ে গয়না বিক্রি করে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দাও।

- আমাকে কচি খুকি পেয়েছো। আমার অলংকারে তোমাদের খুব লোভ! ওটি হবে না।

-এটাই তাহলে তোমার শেষ কথা।

- কতবার বলবো?

-ঠিক আছে। আর বলবো না।

- এইতো কি সুন্দর বুঝলে।

-বুঝাচ্ছি , মাকে নিয়ে বাড়িতে যাই।

- কি করবে? ভয় দেখাচ্ছ? মারবে না কাটবে!

- মায়ের যখন ভালো চাও না। মা যতদিন বাঁচবে ততদিন আমাদের ঘরে থাকবে না।

ফোনটা কেটে দিলাম। একেই বলে সহধর্মিনী। হাসপাতালে রিসেপশনে সমস্যা বলে দু তিন দিন সময় চেয়ে নিলাম। হোটেলে ফিরে গেলাম।

পড়াশোনা করে বেকার। বাবার কিছু জমি জায়গা আছে সেখানে গায়ে গতরে খেটে চাষ করে দিব্যি চলে যায়। মায়ের হার্টের অপারেশন টা না হলে এই সমস্যায় পড়তে হতো না। ফসল বিক্রির সঞ্চিত টাকা সব শেষ হয়েছে। শহরের খরচ খরচা অনেক। থাকার বাড়ি ,গাড়িভাড়াতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।

ভুল হয়েছে আত্মীয় স্বজনেরা কেউ কোনো সাহায্যে নাই। ওদের কথাতে শহরে প্রাইভেট হাসপাতালে মায়ের অপারেশন না করালেই ভালো হতো। বাবা নেই, মামারা প্রায়ই বলতো তোর মাকে দেখিস না। টাকা চেয়ে মুখ নষ্ট করলাম।

হোটেলে শুয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কাল সকালে বাড়ি গিয়ে জমি বিক্রি করে মাকে মাকে ঘরে নিয়ে আসব। পরে প্রয়োজনে লোকের জমিতে লেবার খাটবো।

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ- বিশ্বের কবি,বিস্ময়ের কবি

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক কতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা অর্জন করা যায় জানা নেই। কিন্তু যেহেতু মূলত তিনি বাংলা ভাষায় লিখেছেন, তাঁর সেই লেখাগুলি যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছে এবং তাতে মনে যে বিস্ময় সঞ্চিত হয়েছে তাকে সামলে রাখাও এক সাধারণ বাঙালি হিসেবে স্বভাবতঃই বড় কঠিন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সাথে তুলনা করেছিলেন আর 'মহাভারত' সম্পর্কে বলা হয় যে 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'।অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই ভারতবর্ষেও তা নেই। কথাটি থেকে শরৎচন্দ্রের উপলব্ধি আমরা আন্দাজ করতে পারি। তিনি একদিকে যেমন বাংলার আকাশ-বাতাস, নদী-পাহাড়, সবুজ বনানী,বৈষ্ণব কবি থেকে পাঁচালি ও বাউল গানের মধ্যে বিস্তৃত থেকে বাঙ্গালি সত্ত্বার প্রতিভূ হয়েছিলেন বা হয়ে আছেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতের বেদ-উপনিষদ-দর্শন, ইতিহাস-সাহিত্য-সংগীত ও রূপ-রস-গন্ধ নিসৃত সুধারস আকণ্ঠ পান করে ভারতবর্ষের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির হয়েছিলেন-

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত,যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি

কারণ মানুষ অখন্ড পৃথিবীতে চিরস্বাধীন আর জ্ঞান হলো মুক্ত। তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে ভারতবর্ষকে সেই উচ্চতায় জাগরিত করতে প্রার্থনা জানিয়েছেন,

নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের ভাষায় 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাঙালী-ভাব পরিস্ফুট,সে ভাবের অন্তরে ভারতীয় বোধ জাগ্রত এবং সে ভারতীয় বোধের তলায় বিশ্ব-বোধ প্রবাহিত'। তাঁর সমসাময়িক আরেক বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক 'গ্যাটে' সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি এই বিশ্ববোধ অধিগত করেছিলেন নিজের চেষ্টায় যেখানে রবীন্দ্রনাথ অধিগত করেছিলেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ স্বতোৎসারিত প্রজ্ঞা দিয়ে। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই ছিল অভিনবত্বের ছাপ,ভাষা, ছন্দ ও স্টাইলে নতুনত্বের আস্বাদ। সুতরাং তাঁর রচনা পাঠে বিস্ময়ের উদ্রেক হবে এটাই স্বাভাবিক।

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে ভালো ভাবে জানতে হলে আরেকবার রবীন্দ্রনাথ পড়ে নেওয়া উচিত। কথাটির তাৎপর্য এই যে রবীন্দ্রনাথকে জানার অনেক তথ্য ও সূত্র কবি নিজেই রেখে গেছেন তাঁর জীবনী 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে, বিভিন্ন প্রবন্ধে, চিঠিপত্রগুলিতে,বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় ও বক্তৃতার মধ্যে। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে যা লিখলেন মানুষকে তা বোঝানোর দায়িত্ব আপাততঃ প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁকেই নিতে হবে। সেই জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন,

যে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলই আছে।

এই যে এখন আমরা বিশ্ববোধ আর বিস্ময়ের কথা আলোচনা করছি সে ব্যপারেও তিনি ঈঙ্গিত দিয়ে গেছেন একটি কবিতায় -

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।
ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়।কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধুলির মহাক্ষুধা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবিতাটিতে বিশ্ববোধ ও বিস্ময় দুইই উপস্থিত।ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন আমারা যে বিশ্ব দেখি তা প্রতিটি দিনই কোন না কোন বিস্ময় আমাদের কাছে তুলে ধরে।এভাবে এক একটি দিন অতিক্রান্ত হয়ে যে অতীত তৈরি হয়েছে তাতে দেখা গেছে কত বিশ্বজয়ী বীর শেষপর্যন্ত নিজে অবলুপ্ত হয়ে সামান্য শব্দবন্ধে ইতিহাস হয়ে পড়ে আছে ।এভাবে কত যুগ শেষ হয়ে গেছে,কত

জাতিই না সামান্য ভূখন্ড জয় করার আশায় রক্তের হরি খেলে যে বিজয় স্তম্ভ গড়ে তুলেছিল সেও আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।এই ভাবনা কম বিস্ময়কর নয় এবং একথা কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডেরও নয়। কবি কল্পনা করেছেন এই মূহুর্তে তিনি যে জ্যোতিষ্কমন্ডলের নীচে,সুউচ্চ হিমালয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে,বড় বড় বনস্পতি যার ত্বকে কতো না ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন -আজকের এই দিনটির মধ্যেও না জানি কি কালের ইতিহাস নিঃশব্দে রচিত হয়ে চলেছে-

জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

যে বাংলা ভাষাকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন একসময় সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত মনে করেন নি (যদিও পরে আফসোস করেছিলেন-হে বঙ্গ...) তাকেই একদিন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের আসনে জায়গা করে দিলেন।সেই সাদামাটা আটপৌরে সাধারণ ভাষা তাঁর কলমে কিভাবে অসাধারণ হয়ে উঠলো,আবেগে ভাবে ছন্দময় হয়ে উঠলো তা এখনো আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। মনে হয় এ তো আমাদেরই কথা, ভাবনা,ব্যথা-ব্যাকুলতা,আমাদেরই প্রেম-ভালোবাসার কথা,আমাদেরই হৃদয়বীণার অনুরণন।আমাদের ভাব জাগতিক ভাবের সাথে আপনা আপনিই যুক্ত হয়ে গেলো-

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

আমরা জানি যে কবির ছোটবেলাটা কেটেছিল ভৃত্যদের তত্বাবধানে। চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই পুরো দিনের বেলাটা কাটতো ভৃত্যদের ঘরের এক চিলতে ঘরে।একটি ছোট জানালার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ ও মাটি দেখতে পেতেন তাতেই তিনি পাড়ি দিতেন কতো অজানা সব কল্পনার জগতে।এই অল্প বয়সেই তাঁর সাহিত্যের স্বাদ গ্রহনের ক্ষমতা ছিল। ভৃত্যদের রামায়ণ পাঠ শুনে তার মধ্য থেকে যেমন রামের বনবাস,সীতার জন্য বিলাপ এসব থেকে দুঃখের ইতিহাসের নির্যাস উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন অন্যদিকে মহাভারতের নানান অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। পাশাপাশি দাশরথি রায়ের পাঁচালীর সুর তাঁর প্রাণে এক অদ্ভুত ঝংকারের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বালক বয়সেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের শব্দবন্ধ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে তার মধ্যে থেকে ললিত সুর -ঝংকার বের করে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন।অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রায় গলাধকরণ করে ফেলেছিলেন, এমনকি সদ্য প্রকাশিত বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের পদাবলীর সাথেও পরিচয় করে ফেলেছিলেন।এছাড়াও বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য তাঁকে প্রভূত আনন্দ দান করেছিল।বাধ্যতামূলক পড়াশোনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনদিনই আগ্রহ ছিল না। ইংরাজী পাঠ সে সময় বাধ্যতামূলক ছিল না,তাই ইংরেজীর প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। রাজনারায়ন বসু এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তাঁকে ইংরাজী পাঠে উৎসাহিত করেন।স্কুলের চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা তাঁকে কোনদিনই ধরে রাখতে পারে নি।বড় হয়ে ইঃল্যান্ডে ব্যরিস্টারি পড়তে গিয়ে পড়া শেষ না করেই চলে এসেছিলেন। কিন্তু গৃহশিক্ষকদের কাছে শিক্ষায় তাঁর কোন ফাঁকি ছিল না। এসময় তিনি বেদ,উপনিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য,ইতিহাস, ব্যাকরণ খুব মনযোগ সহকারে পাঠ করেন।এমনকি পড়াশোনার সাথে সাথে শরীর চর্চার জন্য যে কুস্তি অনুশীলন করতেন তাতেও তাঁর ফাঁকি ছিল না।আর সেজন্যই হয়তো পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাঁর জ্বর পর্যন্ত হয়নি।পড়াশোনার প্রতি এই আগ্রহ তাঁর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।শোনা যায় নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী একবার তাঁর সাথে দেখা করতে শান্তিনিকেতনে গেছিলেন। গিয়ে দেখেন কবি একটি বই পড়ায় ব্যাস্ত,ডানপাশে অনেকগুলি বই পড়ার জন্য রাখা ছিল।কবিকে বিরক্ত না করার জন্য তিনি 'পরে আসছি' বলে তখনকার মতো চলে যান। প্রায় দেড় ঘন্টা পরে ফিরে এসে দেখেন ডানদিকের সব বইগুলো বাঁদিকে সরে এসেছে। বিনোদ গোস্বামী বিস্ময়ের সাথে কবিকে জিজ্ঞেস করেন ঐসব বইগুলি কি তাঁর এরমধ্যেই পড়া হয় গেছে? কবি উত্তরে বলেন 'হ্যাঁ'। তারপর তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বলেন পাঠ্যাভ্যাসে কঠোর অনুশীলন ও একাগ্রতা থাকলে কিভাবে অক্ষর থেকে শব্দে, শব্দ থেকে বাক্যে,বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ, এমনকি অনুচ্ছেদ থেকে পুরো অধ্যায় অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে বিষয়ের সারবস্তু অহরণ করা সম্ভব।

টমসনের হিসেব অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙক্তি প্রায় দেড় লক্ষের বেশী আর গদ্য রচনার পরিমাণ তার দ্বিগুনেরও বেশি। তাঁর কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা ৫৬,গান ২২০০ এরও বেশি,নাটক ৬০,উপন্যাস ১৩টি এছাড়াও অসংখ্য চিঠিপত্র,প্রবন্ধ এবং ছবির পরিমাণ প্রায় ২৫০০। সাহিত্যের এতো বিশাল সম্ভার পৃথিবীর খুব অল্প কবি-সাহিত্যিকের সাথেই তুলনীয়। কবি মিল্টনের কবিতার পঙক্তিও ১৮ হাজারের বেশি নয়।সাহিত্যের এমন কোন আঙ্গিক নেই যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেন নি, শুধু মহাকাব্য বাদ দিয়ে। তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক উপন্যাস 'গোরা'কে বলা হয়

মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত।এছাড়াও হাস্যকৌতুক,বর্ণপরিচয় শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা (বিশ্ব পরিচয়) ইত্যাদি তো ছিলোই মানুষের প্রেম ভালোবাসা,আশা -আকাঙ্খা, বিজ্ঞান-কল্পনা, শিক্ষা-নৈতিকতা, ইতিহাস-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা-মানবতাবোধ,কালচেতনা-রাজনৈতিক চেতনা সব কিছুই তিনি স্পর্শ করে গেছেন কলমের যাদুতে। রবীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বৈচিত্র্য। বিষয়, ভাব,ছন্দ সব কিছুতেই এই বৈচিত্র্য। সব রচনা এক সুরে বাঁধা নয়।একটি রচনা প্রকাশ পেলে তাঁর গুনগ্রাহী পাঠকেরা আরেকটি নতুন কিছুর প্রত্যাশায় থাকতো। তিনি যেমন 'আমি যদি দুষ্টুমি করে /চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি' লিখেছেন তেমনি 'ঐ আসে ঐ অতি রভসে'র মতো গুরুগম্ভীর কবিতাও লিখেছেন,যেমন 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে' লিখেছেন, তেমনি 'কালান্তর' এর মতো বজ্রকঠিন প্রবন্ধও রচনা করেছেন, যেখানে বলছেন 'যে তারার আলো নিবে গেছে নিজের মধ্যেই সে সংকুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য'। সাধারণ বাংলা কথা হলেও ভেতরে কী দারুন তেজ! যেমন 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' লিখেছেন তেমনি 'ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে' লিখেছেন, ভজন পূজন ছেড়ে মিথ্যে মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে মানা করেছেন,কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে করেছেন ভীষন আঘাত। তাঁর কলম ছিল অত্যন্ত সাবলীল। ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম গানটি তিনি লিখেছেন অন্তপুরের একটি কোনের ঘরে বসে একখানি স্লেটের উপর-

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

এই বাঁশির সুর যেন তাঁর সমস্ত সত্বাকে সারাজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।পরবর্তী কালে একটি কবিতায় তিনি লিখলেন

আমার একটি কথা বাঁশি জানে
বাঁশিই জানে।ভরে রইল বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা।কেবল বলে গেলাম
বাঁশির কানে কানে।

এখানে বাঁশিকে তিনি যেন মানুষের রূপ দান করেছেন। সাত বছর বয়সী বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়কে তিনি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

কবি ছোট্ট সত্যজিৎকে বলেছিলেন এর অর্থ সে বড় হলে বুঝতে পারবে।স্যজিৎ রায় এই কবিতাটি সারাজীবন পাথেয় হিসেবে বহন করেছেন। তাঁর পরিচালিত সিনেমাগুলিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে।পথের পাঁচালীর মতো সিনেমার কথা ভাবলেই আমরা তা বুঝতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ আরো এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা,বিষাদ-গাথা অন্তরে সমাহিত ও তদ্গত করে রাখতেন আর সেগুলিকে রচনায় মূর্ত করে তুলতেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন এ ব্যাপারে সারা বিশ্বে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। মৃত্যু তাঁর জীবনকে প্রায় জর্জরিত করে তুলেছিলো। ১৮৭৮ মায়ের মৃত্যু, ১৮৮৪ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু,১৯০২ স্ত্রীর মৃত্যু ১৯০৩ দ্বিতীয় কন্যা রেনুকার মৃত্যু,১৯০৫ পিতার মৃত্যু আর আরো বেদনাদায়ক ১৯০৭ সালে প্রিয় পুত্র শমীর মৃত্যু।এসব মৃত্যুতে কবিকে প্রকাশ্যে বিলাপ করতে দেখা যায় নি ।সেই শোককে তিনি লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।বিশ্বযুদ্ধের অশনিসংকেত।এসময় তিনি 'গীতাঞ্জলি' অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন।এর বেশ কিছুদিন পর কবি নিছক সময় কাটানোর জন্য সেই কবিতাগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে থাকেন।বন্ধুবর রদেনস্টাইন সেটা দেখতে পেয়ে এই পান্ডুলিপি নিয়ে সোজা চলে যান তখনকার দিনে পাশ্চাত্য জগতের বিখ্যাত কবি ডব্লিউ বি ইয়েটসের কাছে।তিনি আশ্চর্য হয়ে কবিতাগুলো পড়তে থাকেন ও একটি ভূমিকা রচনা করেন।১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর পৃথিবীর সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে সে বছর এই বই 'সং অফারিংস' নাম ধারণ করে নিয়ে আসে ভারতের প্রথম নবেল পুরস্কার।

বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন 'এমন কবিকে বিশ্বকবি বলা সংগত,যাঁর চিন্তার জগতের সাহিত্য এক ও অভিন্ন-রূপকরণে অফুরান ভাবে বিচিত্র হলেও নির্যাসে এক, বিশাল ও বিরতিহীন উৎসবের মতো উপস্থিত, যেখানে সব যুগ,সব জাতি একত্র হয়েছে'। তাই আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, এক বিস্ময়ের কবি, আমাদের চিরকালীন গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু।

আগামী প্রজন্ম

অবিনাশ ব্যানার্জী

''ওঠো জাগো লক্ষ্যে পৌঁছানো অবধি থেমো না''- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও স্বামীজির এই বাণীটিই হবে বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র। বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষই পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে চিন্তিত। আর হবেন নাই বা কেনো? বর্তমান সমাজে যা চলছে - জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, চাকরি নেই , সমাজে প্রতিনিয়ত মারদাঙ্গা লেগেই থাকছে,নেতা মন্ত্রীরা দুষ্কর্মের জন্যে গ্রেপ্তার হচ্ছেন আবার কেউ কেউ তো নিজের প্রচার করতে আমাদের দেশের ইতিহাসই বদলে ফেলতে চাইছে ! 'প্রাণীকুলে মানুষই শ্রেষ্ঠ '- তাই এই মানুষদেরই এমনি নীচ কার্য কখনোই কাম্য নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই রকম সমাজ থেকে কি শিখবে ? এই নিয়েই সকলে চিন্তিত। আমার মতে ভবিষ্যতে সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য আগামী প্রজন্মদেরই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তার জন্য তাদের সর্বদা 'নিয়মানুবর্তিতা' মেনে চলতে হবে। আসলে নিয়মানুবর্তিতা হলো জীবনের ও সমাজের মূল চালিকাশক্তি। এছাড়া তাদের সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে হবে।শিষ্টাচার ও সৌজন্য হলো সমার্থক শব্দ। কারণ সৌজন্য কথাটি এসেছে সজ্জন/সাধু কথা থেকে আর শিষ্টাচার এর শিষ্ট ও আচার এর অর্থ পরিশিলিত, নীতিমান, শিক্ষিত, সুশীল। এই দুই এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্ম যদি জীবন যাপন করে তাহলে আখেরে লাভ আমাদের সমাজেরই হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে - " Man is known by his friends - অর্থাৎ বন্ধুবর্গের আচরণের মাধ্যমেই কোনো ব্যক্তির ব্যাক্তিগত পরিচয় ফুটে ওঠে। তাই শুধু নিজে ভালো হলে চলবে না অপরজনকেও সুশিক্ষা দিতে হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই কোনো বীজের অঙ্কুর থেকেই যেমন মহীরূহ জন্ম নেয়, ঠিক তেমনি ছাত্রদের আচরণ থেকেই কোনো দেশের, কোনো জাতির ভবিষ্যত নাগরিকদের সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। তাই জন্যে আমাদের সকলের উচিত ছাত্রসমাজকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রকৃত মানুষ করে তোলার চেষ্টা করা। নাহলে একটা সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন কখনোই সত্যি হবে না!!!

এই ছাত্রসমাজই দেশের জাতির মেরদণ্ড। তাই এই মেরুদন্ডকে সোজা রাখার জন্য আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। ভবিষ্যত সমাজের ছেলে মেয়েরা যেন নৈরাশ্য হতাশাকে প্রশয় না দেয় সেই বিষয়ে আমাদেরই নজর রাখতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে তারা যেন কখনোই মুখবুঁজে কোনো অন্যায় সহ্য না করে।তারা অন্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে।তবে তাদের ভাষা হবে সংযত শিষ্টাচার সম্মত। কোনো রূঢ় ভাষণ চলবে না । বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার কথা শেখাতে হবে তাদেরকে। বর্তমানে একটি সমস্যা হলো ছাত্র সমাজের কেউই অল্পতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদের এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া তারা এখন মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্ত যা একদমই ভালো লক্ষণ নয়। অনেকে বলেন মোবাইল এর প্রতি আসক্তি পড়াশুনায় ক্ষতি করছে। তবে আমার অভিমত শুধু পড়া কেনো ? পড়া ছাড়াও তারা এখন মাঠে যেতে চায়না, গেলেও তাদের সঙ্গে সর্বত্র মোবাইলফোন বিরাজমান। যেখানে মোবাইলের দরকার সেখানে অবশ্যই মোবাইল নিয়ে যাওয়া উচিত। তবে অপ্রোয়জনে মোবাইলের ব্যবহার বেশি না করাই ভালো। তাছাড়া আজকের এই ডিজিটাল দুনিয়ার যেভাবে প্রতারণা হচ্ছে তাই জন্যে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যাবহার না করাই ভালো। তারা সর্বক্ষণ চ্যাটিং এ ডুবে রয়েছে।এই চ্যাটিং করা অবশ্যই ভালো তবে এতে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয় না কারন সামনা সামনি বন্ধুর সাথে কথা বলা আর ফোনে চ্যাট করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে । এখন নতুন প্রজন্মের অধিকাংশজনই প্রানবন্ত নয়। তারা জীবনে বাঁচার আনন্দটাই বুঝতে পারে না। এইরকম ছেলে মেয়েদের পাশে থাকার জন্য সমাজের অভিজ্ঞ মানুষদের এগিয়ে আসা উচিত কারণ তাদের এই ভাবে হতাশাগ্রস্থ হতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। আমরা জানি এখন প্রচুর যুবক যুবতী মাদকাসক্ত। এদেরকে এইরকম ভাবে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। তাদের পড়াশুনার পাশাপাশি সাহিত্য গান বাজনা খেলা ধুলার প্রতিও আকৃষ্ট করতে হবে। তবেই একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। বর্তমানে

অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে না, ভয় পায় না ওই জন্যই এখন সমাজেই বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের উচিত তাদের বোঝানো বাবা মায়ের গুরুত্ব কতখানি,যখন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে এই পৃথিবীতে অসহায় থাকে তখন এই বাবা মাই তাদের মমতা, স্নেহ,শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে আর জীবনচক্রে তারা যখন বৃদ্ধ হয় তখন সেই ছেলেমেয়েরাই তাদেরকে অবহেলা করে। বৃদ্ধ হলে বাবা মা সন্তান এর প্রতিই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে এই নির্ভরতা যে অর্থনৈতিক নয় শুধু ভালোবাসা, সঙ্গদান , ভক্তিভিত্তিক এটা তাদের বোঝাতে হবে। আগামী প্রজন্ম হবে বিজ্ঞানমনস্ক কারন মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতা ও তার পৃষ্ঠপোষকতার সরাসরি সম্পর্কটা বোঝা যায়। বিশ্বায়নের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। তাই নিজেদের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সুস্থিতির জন্য বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।আগামী প্রজন্মকে ত্যাগ ও সততার মধ্যে জীবনযাপন করা উচিত। বর্তমানে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মানুষের সেবা করতে চায় না তবে আমাদের দেশে কিন্তু জীবসেবা শিবসেবা' বলে পরিগণিত এটা তাদের বোঝাতে হবে। সমাজে শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ''মনুষ্যত্ব''। আর এই মনুষত্ব অর্জন মানুষের জন্যে পশুর জন্য নয়। পশুর পশুত্ব কিন্তু কখনো হারায় না তবে মানুষ তাদের স্বর্থচিরিতার্থ করার জন্য নিজেদের মনুষ্যত্ব ত্যাগ করে ফেলে। এটা বন্ধ করতে হবে। না হলে সুন্দর জাতি সমাজ বা দেশ কোনোটাই গড়ে উঠবেনা। বর্তমান প্রজন্ম উন্নততর চিকিৎসা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারে তাদের এই বিষয়ে আরো আগ্রহী করে তুলতে হবে। তবে তাদের শিক্ষাগত মান আরো ভালো হবে তবেই না আমাদের সমাজের, দেশের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের টক্কর দিতে পারবে । বর্তমানে জলপথ স্থলপথ আকাশপথ আমাদের নখদর্পণে। আমার আশা ভবিষ্যত প্রজন্ম এই সব বিষয়ে আরো আরো উন্নতি করতে পারবে।বর্তমানে বড় সমস্যা হলো বর্তমান শিক্ষা মানুষের বৈষয়িক বুদ্ধি বাড়াচ্ছে এবং এই বুদ্ধি দ্বারা পার্থিব ধনসম্পদ পাওয়া গেলেও মানুষ হওয়া যায় না। ধনসম্পদ অবশ্যই দরকার তবে তার থেকেও বেশি দরকার মানুষ হওয়া। নবপ্রজন্মকে বোঝাতে হবে ইচ্ছা যদি কল্যাণমুখী হয় তবে মানুষ নিজের যেমন ভালো করে তেমনি অন্যের ও ভালো করে।আমার এই বিষয়গুলির দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে আমরা আশা করতে পারবো।স্বামীজি বলেছিলেন ''আমাদের শত শত মতভেদ থাকলেও আমরা প্রত্যেকে অন্যের মতভেদ স্বীকার করে নিতে একযোগে কাজ করবো''। আমার মনে হয় এই কথাটি যদি আমাদের আগামী প্রজন্ম বুঝে যেতে পারে তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে বলতেই পারি ''ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।''

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই.....

মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। নারী শিক্ষার দিশা হল কন্যাশ্রী। এটি একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প, যা আজ সারা বিশ্বে সম্মানিত।

২। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী। ৩। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।

৪। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক।

৫। আসুন শৌচাগার গড়ি, মনের সুখে ব্যবহার করি।

৬। বিলাব কেন মা বোনের মান, রাখব ধরে ঘরে নারীর সম্মান।

আমাদের অঙ্গীকার–

সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে সততা, নিষ্ঠা, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা দায়বদ্ধ।

বালিকা রায়
উপ প্রধান

অঞ্জন সিংহরায়
প্রধান

শওকত আলি

(ঔপন্যাসিক ও গল্পকার)

শংকর ব্রহ্ম

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ায় তাদের কাঁচা-পাকা দালানের বাড়ি। সাথে আছে পুকুর, বাড়ির লাগোয়া খেতে সবজি হয় আর চারদিক ঘিরে আছে গাছগাছালি। একটু দূরেই ঝিল দেখা যায়। গ্রাম বাংলার রেশ কাটিয়ে না ওঠা ছোট মফস্বলে বেড়ে উঠেছেন বালক 'শওকত আলী'। শিশুদের জীবনে শহুরে আবেশ নেই, ধরাবাঁধা বয়সে স্কুলে যাওয়ার বালাই নেই। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা সহ নানা ধরনের খেলাধুলার সাথে মিতালী করেই কেটে যায় সারাটা দিন। তবে একদম ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির মাঝে অনেকটা নিমগ্ন থাকতেই ভালোবাসতেন শওকত আলী। অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে প্রকৃতিকে অনেক কাছ থেকে দেখার এই সুযোগ তাকে জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক হয়ে উঠার পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

শওকত আলির জন্ম ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে রায়গঞ্জের উকিলপাড়ায় (পশ্চিমবঙ্গ)।

বাবা খোরশেদ আলী সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস করতেন। তখন ইংরেজদের শোষণ চলছে দেশে। তিনি পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। বাড়িতে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতির আলোচনা হতো। বাড়িতে বইয়েরও অভাব ছিল না। রাজনীতি তো বটেই, সাহিত্য কবিতা প্রভৃতি বইয়েরই ভাল একটা সংগ্রহ ছিল খোরশেদ আলীর। বাড়িতে রাখা হতো সাহিত্য পত্রিকাও।

শওকত আলীর মা সালেমা খাতুনেরও পড়ালেখার ঝোঁক ছিল, কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় লেখা-পড়ার স্বপ্নে ভাটা পড়ে। তবে বিয়ের পর হুগলি থেকে ডিপ্লোমা করেছিলেন সালেমা খাতুন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

মায়ের কাছ থেকেই পড়ার আগ্রহ জন্মে শওকত আলীর। বাবা কংগ্রেস করলেও মা ছিলেন মুসলীম লীগের সমর্থক।

১৯৪৯ সালে শওকত আলী যখন ক্লাস এইটে পড়ে, তখন তার মা মারা যান। তারপর থেকে বাবাকে একা বইয়ে ডুবে থাকতে দেখে, শওকত ভাবতেন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার এই উপায়টা তাকে আরও ভালভাবে রপ্ত করতে হবে। বইয়ের রাজ্যে তিনিও ডুব দিলেন।

রায়গঞ্জ করোনেশান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন শওকত আলী। ছাত্র ইউনিয়নের কাজে সক্রিয় হয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েন নানা ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের সাথে। ফলে জেলেও যেতে হয়েছে তাকে। জেলে যাওয়ায়, জীবনকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। মানুষের জীবনের সাথে সংগ্রাম, দুঃখ আর আর তাই জেলে বসেও পরীক্ষা দিয়েছেন তিনি। এই কলেজ থেকেই আই.এ এবং বি.এ পাশ করেছেন।

এরই মধ্যে ভারতের রাজনীতিতে এসেছে গুণগত পরিবর্তন। ভারতবর্ষ এখন শুধু আর শুধুমাত্র একটিমাত্র রাষ্ট্র নয়। জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান নামের আরেকটি রাষ্ট্র।

দেশভাগের পরপরই ১৯৫২ সালে,পূর্ব বাংলায় স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শওকত আলীর বাবা। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেও বাঙালি মুসলমানেরা নানাভাবে তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

নতুন দেশ পাকিস্তানের জন্মের সাথে সাথে সাধারণ বাঙালি মুসলমানেরা স্বপ্ন দেখতে থাকেন, নতুন দেশে মিলবে তাদের প্রাপ্য সব অধিকার। অনেকটা সেই আশা বুকে নিয়েই খোরশেদ আলী দিনাজপুর ছেড়ে চলে এলেন পাকিস্তানে।

শওকত আলীর স্মৃতিঘেরা সেই রায়গঞ্জ তখন কাঁটাতারের ওপাশে। বেদখল হয়ে গেছে তাদের সেই সবুজে ঘেরা বাড়িটি। দেশভাগের দাঙ্গা-হাঙ্গামাও তরুণ শওকত আলীর মনে বেশ রেখাপাত করে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ১৯৮৯ সালে তিনি লিখেছেন 'ওয়ারিশ' উপন্যাস। যেখানে তিনি সুনিপুণভাবে ইংরেজদের অত্যাচার-শোষণ, দেশভাগ আর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন।

বাবা ছিলেন হোমিও চিকিৎসক, তাই প্রথম জীবনে তিনিও চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় আর্টস (কলা-বিভাগ) নিয়েই পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই.এ এবং বি.এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বাংলায় এম.এ পড়ার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে এসেই বুঝতে

পেরেছিলেন, মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তিনি বাংলাকে ধারণ করে সাহিত্যজগতে গল্প লেখা শুরু করেছিলেন, যেই বাংলার উপর আঘাত তিনি মেনে নিতে পারেননি। পাকিস্তানী শাসকদের বাঙালিদের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'উর্দু' চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে তিনি নেমে আসেন রাজপথে। ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে স্ফুরণ জাগ্রত হয়, তাকে নিয়ে অনেক দূর হেঁটে নিয়ে গেছেন শওকত আলী। পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসনের বিরোধী হয়েও রাজপথে আন্দোলন করেছেন। ১৯৫৪-র ৯২(ক) ধারা জারি করা হলে গ্রেফতার হয়েছিলেন শওকত আলী, ফরহাদ মজহার আর হাজি মোহাম্মদ দানেশের মতো সক্রিয় ব্যক্তিরা।এই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনেকটাই উঠে এসেছে তার লেখায়। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে পরম মমতায় তুলে এনেছেন শওকত আলী।

শওকত আলীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের একটি হলো 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। ১৯৮৪ সালে এই উপন্যাস প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নেন শওকত আলী। অনেক পাঠক এই উপন্যাসটিকে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে আখ্যা দিলেও শওকত আলীর মতে,তঐতিহাসিক একটি সময় বা পর্যায়কে নিয়ে লেখা হয়েছে 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। এই উপন্যাসে কোনও সময় বা ঘটনার প্রামাণিক কোনো কিছুকে উপস্থাপন করা হয়নি। কাহিনী ও ইতিহাস যখন পড়তাম, তখন আমার মনে অনেক জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হত।

যেমন লক্ষণ সেন। রাতের খাবার না খেয়েই লক্ষণ সেন পালিয়ে গেল। বখতিয়ার খিলজি কিন্তু তখনও বাগেরহাট সীমানায় আসেননি। এই যে ইতিহাসের এসব ঘটনা;আমাকে খুব ভাবায়। সেই সাথে আমার মনে জাগে;ইতিহাসের এই পালাবদল;এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? এসব ভাবতে ভাবতেই 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' লেখার চিন্তা হয়।দ

'প্রদোষে প্রাকৃতজন' নামকরণ নিয়ে শওকত আলী বরাবরই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। মূলতঃ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক কালের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে যখন নতুন কালের সূচনা হচ্ছে, সে অন্তবর্তী সময়কেই বলা হয় প্রদোষকাল। এই অঞ্চলে যখন হিন্দু শাসনের শেষে মুসলিম শাসনের সূচনা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় নিয়ে এই উপন্যাস। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হল, উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে বড় হয়েছে এই সময়ে সাধারণ মানুষ কী ভাবছে এই নিয়ে। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে নতুন ধর্ম, নতুন চিন্তা ও বদলে যাওয়া শাসকদেরকে কেন্দ্র করে সাধারণ কিছু জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে ইতিহাসের কালস্রোতে। উঠে এসেছে প্রান্তিক মানুষের গল্প।

'বসন্তদাস', 'লীলাবতী', 'ছায়াবতী'রা প্রত্যকেই সাধারণ মানুষের স্বার্থক রূপক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেন।

উপন্যাসের একদম শেষে 'শ্যামাঙ্গ'কে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আরও ভাল করে বলতে গেলে, ঐ সময়ের সমাজ আর সভ্যতার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে হেরে গেছে এই মৃৎশিল্পী। তাই এই উপন্যাস শেষ করে সাধারণ মানুষের করুণ আকুতি তীব্র হয়ে ধরা দিয়েছেন পাঠকের মনে। অকপট চিত্তে শওকত আলীও স্বীকার করে গেছেন, এই 'মৃত্তিকালগ্ন মানুষ' আজীবন তাকে মোহের মতো টেনেছে।

সেই মোহ ধরানো মৃত্তিকালগ্ন মানুষগুলোই তো ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করেছে, এদের মধ্যেই উন্মেষ ঘটেছে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের, মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার ক্রান্তিলগ্নে আশায় আলোয় বুক বেঁধেছে একটি সুন্দর নাগরিক জীবনের। আর এই ব্যাপারটিকে শওকত আলী 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কাল স্রোত' ও 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' তাঁর বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস তুলে ধরেছেন। এই ত্রয়ীর জন্য তাকে ভূষিত করা হয়েছে 'ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কারে'। এই তিন কালজয়ী উপন্যাসের ব্যাপারে শওকত আলী বলেছেন,ষাটের দশকের মানুষের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার যে পরিবর্তন আসছে, সেটাই 'দক্ষিণায়নের দিন', যার মানে হচ্ছে শীতকাল আসছে। 'কুলায় কাল স্রোত' হচ্ছে পরিবর্তন যেখানে আঘাত করছে। আর 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' হচ্ছে নতুন সময়টি আসার একেবারে আগের সময়টি। মূলত ষাটের দশকে আমাদের মধ্যবিত্ত এবং সমগ্র সমাজব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আসে। নতুন একটা চিন্তা-চেতনা দ্বারা আলোড়িত হয় পুরো সমাজ। ধ্যান-ধারণা চাল-চলন জীবনব্যবস্থায় একটি পরিবর্তনের সুব কর্মজীবনে তিনি পেয়েছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো বন্ধু দের। জগন্নাথ কলেজে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আর শওকত আলী একসঙ্গে শিক্ষকতাও করেছেন। 'চিলেকোঠার সেপাই' আর 'খোয়াবনামা'র কারিগরকে দেখেছেন,শিখেছেন। স্বাধীনতার পরে বাংলা সাহিত্যকে হাতে ধরে অনেকদূর নিয়ে যাওয়ার যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, সেখানে সামনে

থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই দু'জন।

টিকাটুলীর 'বিরতি ভিলা'র নীচের তলার একটি ঘরে থাকতেন ইলিয়াস। শওকত আলীও তার জীবনের শেষসময়টি কাটিয়ে দিয়েছেন একই ঘরে।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল,শওকত আলী আর আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্মদিনটিও একই দিনে, ১২ ফেব্রুয়ারি। বয়সে ইলিয়াসের চেয়ে বছর সাতেকের বড় ছিলেন শওকত আলী। কিন্তু ১৯৯৭ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অকালপ্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন শওকত আলী।

শওকত আলীও চলে গেলেন ২০১৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি। নিভৃতচারী এই মানুষটি চলে যাওয়ার শেষ জীবনে আরও বেশি অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছিলেন। চারদিকে সাহিত্যসভা, বইমেলা, লেখক আড্ডা থেকে অনেকদূরের দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন নিজেকে। কিন্তু কেন? উত্তরটা অনেকটা এভাবেই দিয়ে গেলেন, তঅপ্রয়োজনে অনেক শব্দ খরচ করতে ভাল লাগে না। আমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেছে, যদি আরো একটু শক্তি থাকতো তবে কিছু কিছু মানুষের কথা লিখতাম, বাকি রয়ে গেলো।দ

তবে আক্ষেপ থাকলেও কম লেখেননি বাংলা সাহিত্যের প্রদোষকালের এই প্রাকৃতজন। বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিয়ে রচনা করে গেছেন 'পিঙ্গল আকাশ', 'অপেক্ষা', 'গন্তব্যে অতঃপর', 'উত্তরের খেপ', 'অবশেষে প্রপাত', 'জননী ও জাতিকা', 'জোড় বিজোড়'।

স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার', 'অজিত গুহ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার', 'আলাওল সাহিত্য পুরষ্কার', 'একুশে পদক' প্রভৃতি। কিন্তু সবচেয়ে বড় সম্মান 'পাঠকের ভালবাসা' নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই.....

আবুজহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে গৃহ অনুদান।
- "জল ধরো... জল ভরো... /কৃষি বাঁচাও... জীবন গড়ো" এর সার্থক রূপায়ণ। স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- "মিশন নির্মল বাংলা"-র লক্ষ্যে পঞ্চায়েতভুক্ত প্রত্যেক পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্পে একশ শতাংশ সহায়তা প্রদান।
- সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ধারাবাহিক আন্দোলনে শরিক।
- পঞ্চায়েতভুক্ত সকল নাগরিককে পঞ্চায়েতমুখী করণ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

রমজান শা
প্রধান

এক প্রধান শিক্ষকের অপ্রকাশিত জীবনী

প্রকাশমান বসু

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু ছিলেন একজন শিক্ষক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী,অভিভাবক, সমাজসেবী। তিনি হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের দশঘরা গ্রামের ১৪ ঘর বসু বাড়িতে এক অত্যন্ত গরিব পরিবারে ৭ ফেব্রুয়ারি,১৯৩৭

খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বসু, মাতা স্বর্গীয়া প্রভাস নলিনী বসু। তিনি প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন,হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা পাস করার পর IA পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা না থাকার জন্য বড় দাদাদের পরামর্শে বেসিক ট্রেনিং নিতে ইটাচুনা কলেজে ভর্তি হন।সেখানে সফল হয়ে মাত্র ১৯ বছর বয়সে শিক্ষকতা শুরু করেন।গরীব একান্নবর্তী পরিবারে জন্ম গ্রহণের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে উপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন। বড় ভাইদের সাথে মিলে বোনেদের বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। এর পর শুরু হয় সমাজ সেবা , স্কুলের উন্নতি স্কুল পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নতি,সাথে ১৪ ঘর বসু বাড়ির শ্রী শ্রী শ্রীধর জিউ স্টেটের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সমাজ সেবার কথা বলে শেষ করা যাবে না।বহু গ্রামের বহু গরিব ছাত্রের পড়াশোনার ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন।আরো কত কি ! ওনার স্কুল ছিল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে (দশঘরা স্টেশন বাজারের কাছে বাজে সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়)। উনি কোনো রকম স্কুল ফি নিতেন না (যদিও তা ছিল নামমাত্র)। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে আসতেন। নিজের বেতন থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতেন। মহিলা শিক্ষার কথা বাড়ি বাড়ি যেয়ে বোঝাতেন । ষাটের দশকে মুসলিম পরিবারে,শুধু মুসলিম পরিবার কেন,গরিব হিন্দু পরিবারে গিয়ে এটা বোঝানো একেবারেই সহজসাধ্য ছিল না।টালির চালের স্কুল ঘরের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সেটাকে সুন্দর ভাবে তৈরি করা,পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগানো, বাগান করা, রাস্তা বানানো , সব কিছু তিনি নিজে একা হাতে করতেন।তাঁর ৪১ বছরের স্কুল জীবনের একটা দিনও তিনি স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন না। ওনার মাতা যেদিন মারা যান সেই দিন সারা রাত মাতাকে দাহ করে পরদিন সকাল ৯ টার মধ্যে স্কুলে উপস্থিত হতেও দেখা গেছে তাঁকে।

এ তো গেল স্কুলের কথা। ১৪ ঘর বসু বাড়ির শ্রী শ্রী শ্রীধর জিউ স্টেট প্রায় এক হাতে ৫৫ বছর সামলেছেন তিনি। সেখানে নিত্য পূজা,দুর্গা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা , লক্ষ্মী পূজা,স্বরস্বতী পূজা , রাস পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা সব পূর্ব পুরুষদের আচার মেনেই করতেন।ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা,ঠাকুর মন্দিরের রং , রিপেয়ারিং এর কাজ , মন্দির পরিস্কার পরিছন্ন রাখা তিনি সব নিজ হাতে করতেন। প্রধান সড়ক থেকে ১৪ ঘর বসু বাড়িতে প্রবেশের দীর্ঘ পথও তিনি নিজে দীর্ঘ দিন ধরে নিজে মাটি ফেলে বানিয়েছিলেন। ঠাকুরের পুকুর পাড় নিজে মাটি ফেলে বানান।বৃক্ষ রোপন,সুন্দর সবুজ পরিবেশ তৈরি করা ওনার নিত্য দিনের কাজ ছিল। আর এই সব কাজ নিজে হাতে তিনি করতেন।

উনি ১৯৯১ সলে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের Census of India বা জনগণনার কাজ , এক আকাশ ছোয়া উচ্চতায় পৌঁছে দেবার জন্য ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি R Venkataraman তাঁকে একটি রৌপ্য পদক এবং একটি সার্টিফিকেট প্রদান করেছিলেন,তা আজও ওনার বাড়িতে সংরক্ষিত আছে।

বহু কিছু করার সত্ত্বেও নিজেকে কোনো দিন তিনি আলোয় নিয়ে আসেননি। নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো বাড়িতে কোনো দিন রাত্রি যাপন করতে দেখা যায় নি তাঁকে।সারা জীবন কোনো দিন চপ্পল পড়তেও দেখা যায় নি।খালি পা নিয়েই সব করতেন। এমন কি স্কুলেও খালি পায়ে যেতেন।শেষ জীবনের কয়েকটা দিন ছাড়া তাঁকে কোনো দিন অসুস্থ হতেও দেখা যায় নি।তিনি ২৫ জুলাই,২০২২ ইহলোক ত্যাগ করেন। বর্তমান যুগে তাঁর মতো মানুষ সত্যিই বিরল।

ভ্রমণ কাহিনী

এক আতঙ্কের সফর

সুরঞ্জন দেব

উড়িষ্যার রাউরকেল্লায় এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে বাস ভাড়া করে যাত্রা শুরু হয়। হঠাৎ করে বেশ কিছুজনকে যেতে হবে, ট্রেনের টিকিট শেষ মুহূর্তে না পাওয়ার কারণে ঠিক হয় বাস রিজার্ভ করে যাওয়া হবে। যেহেতু সারা রাতের সফর তাই উপযুক্ত সুবিধা সহ বাসের সন্ধানপর্ব শুরু হলো। সন্ধানপর্ব শেষে নির্দেশমতো সবাই নির্দিষ্ট জায়গায়,নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়ে গেলো। কথায় আছে, পহেলে দর্শনধারী, বাদ মে গুণবিচারী। দর্শনে ইন্দ্রিয়সুখ, তাই প্রতিবাদ,প্রতিরোধের বাধা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করার পর ড্রাইভার সাহেব গিয়ার উন্মুক্ত করে সফরসঙ্গীদের অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের মাত্রা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী করে অগ্রগমন শুরু করে দিলেন।

ঘূর্ণায়মান চাকার অগ্রগতি সাময়িক স্বস্তির অবকাশ নিয়ে আসলেও এক অতীব নিরাশাব্যঞ্জক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ না করলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাস ছাড়বার কিছু আগে জানা যায় যে আমাদের ড্রাইভার সাহেব রাস্তা চেনেন না, বাসে দ্বিতীয় কেউ নেই যে রাস্তা চেনে। সকলের চিন্তার অবসান ঘটিয়ে এক সহযাত্রী জিপিএস দেখে সারা রাত ড্রাইভারকে সহায়তা করার অঙ্গীকার করলে সকলেই আশ্বস্ত হয়, প্রাথমিক ধাক্কা প্রতিহত হয়।

বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে বাস এগিয়ে চলে।হাসি ঠাট্টা করতে করতে বাস এসে পৌঁছায় এক ধাবায়। রাতের খাবার সেখানেই সাঙ্গ করে আবার শুরু হয় এগিয়ে চলা। খড়গপুর অবধি রাস্তা জানা ছিলই।এরপরের রাস্তা অচেনা,মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা এবং রাত এগারোটা বেজে গেছে তাই ধরে নেওয়া হলো পথনির্দেশ মেলার কোনো সুযোগ নেই, অতএব মোবাইলের শরণাপন্ন হতে হলো। পথনির্দেশকারী জিপিএস এর নির্দেশমতো চলতে চলতে কখন যে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করে ফেলেছি রাতের অন্ধকারে কারোই তা বোধগম্য হয় নি। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী জঙ্গলে মোবাইলের সিগন্যাল চলে যাওয়ায় সারারাত জঙ্গলেই ঘুরপাক খেতে থাকি। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বুঝতে পারা যায় আমরা দিকভ্রষ্ট। বাস চলতে থাকে কিন্তু সঠিক রাস্তা তখনও অধরা। অচেনা জঙ্গলে পথ হারানো এবং সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় আর নেই প্রায় ।মানসিকভাবে বিধস্ত সকলেরই এক মত যে জীবনের সব থেকে বড়ো ভুল যা আর শোধরানোর কোনো উপায় নেই। এভাবে চলতে চলতে এক রেললাইনের ধারে এসে উপস্থিত হলে সবার মনে আশার আলো জাগে যে এবার মানুষের উপস্থিতির সৌজন্যে সঠিক রাস্তা পাওয়া যাবে। এক ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে চায়ের দোকানের খোঁজ চলতে থাকে। দোকানের খোঁজ মেলে কিন্তু চা পেতে বেশ কিছুটা দেরী হবে শুনে সকলেই আবার বাসে উঠে গন্তব্যে রওনা দেই। অনেক দেরী হলেও পৌঁছে যাই নির্দিষ্ট জায়গায়।

কাজকর্ম মিটে যায় ঠিকমতোই। একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আবার ফেরার পালা। এরপরও যে কতো দুর্গতি অপেক্ষা করে ছিলো আমাদের জন্য, তা কারো ধারণাতেই ছিলো না। সন্ধ্যের মুখে ফেরার জন্য আবার যাত্রা শুরু হয়। যেহেতু অচেনা পথ, তাই সকলের রাতের খাবার প্যাক করিয়ে নেওয়া হয় সময়মতো খেয়ে নেওয়া হবে। রাত নয়টা নাগাদ খাবারের প্যাকেট দেওয়া হলে অনেকেই খাওয়া শুরু করে আর তখনই বোঝা যায় যে বিপদ তখনও আমাদের ছেড়ে যায় নি। বিরিয়ানীর প্যাকেটে বিপত্তি লুকানো ছিলো। নষ্ট হয়ে যাওয়া বিরিয়ানী মুখে দিয়েই ফেলে দিতে হয়। বোঝা যায় যে সকলেরই এক অবস্থা। কোনোক্রমে এক হোটেল পেয়ে রাতের খাবার ব্যবস্থা হয়। এরপর বাস চলতে শুরু করার কিছু পরেই ভগ্নপ্রায়

পাহাড়ী রাস্তায় বাস এসে পৌঁছায়। আগে থেকে জানা থাকায় অবাক হওয়ার কিছু ছিলো না কিন্তু বাসের দুলুনি আর হেডলাইটের আলো জানান দিচ্ছিলো যাত্রা নির্ঝঞ্ঝাট হবে না। অনেকটা রাস্তা এভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরে এসে পৌছায় সমতল রাস্তায়। বাস এগোতে থাকে আর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পরে।

অনেক রাতে রাস্তার ধারে অন্ধকারে বাস দাঁড়িয়ে পড়ায় আবার খোঁজখবর শুরু হয় নতুন কোনো বিপদ এলো কি না। নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো যে এবার বাস যান্ত্রিক গোলযোগের সম্মুখীন। ঘন জঙ্গল, দলমা রেঞ্জ, সবাইকে অনুরোধ করা হলো বাস থেকে না নামার কিন্তু ভয়কে যে সবাই জয় করে ফেলেছে ততক্ষণে। চারদিকে ঘন জঙ্গল, অন্ধকার। যারা নেমেছে বাসের সামনেই দাঁড়িয়ে সবাই, একা পিছনে যাওয়ার মতো সাহস নেই কারো। এক অজানা আতঙ্ক ঘিরে আছে সবাইকে। সেখানে অনেক চেষ্টায় কোনোরকমে বাস চলার মতো অবস্থায় এনে জঙ্গল থেকে বেরোনো প্রাথমিক উদ্দেশ্য ঠিক হলো, এরপর সকাল হলে মেকানিক ডেকে ঠিক করে নেওয়া হবে। আরও কয়েকবার থেমে অবশেষে এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে কিছু দোকানপাট রয়েছে। মেকানিকের খোঁজ পেয়ে জানা গেলো সারাদিন লাগবে ঠিক হতে। তার হাতে ঠিক করার দায়িত্ব দিয়ে সকালের জলখাবার সেরে নিলো সকলেই।

সারাদিনের বিরতি কিন্তু সময় কাটবে কি করে। অনেকেই নিজের মতো করে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। আমরাও কয়েকজন আশেপাশে ঘুরে দুপুরে স্নানের জন্য এক নদীর খবর জানতে পারলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা পথে কিছুটা গেলেই নদী পাওয়া যাবে শুনে আমরা জঙ্গলে ঢুকে এগোতে থাকলাম। বেশ কিছুটা এগোনোর পর আমাদের পথ আটকে দাঁড়ান বনদপ্তরের কর্মী এবং ভর্ৎসনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে দপ্তরের আধিকারিক খবর পেয়ে হাজির হন এবং আমাদের উদ্দেশ্য শুনে জানান যে এক হাতি এখানে ঘুরছে আর গত কয়েকদিনে হাতিটির দ্বারা তিনজন মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। উনি আমাদের ফিরে যেতে বলায় আমরা বিষন্ন চিত্তে ওনাকে আমাদের বিপর্যয়ের ঘটনা জানালাম। উনি বাকি কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাতিটির অবস্থান জেনে আমাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্নান সেরে ফিরে যাবার শর্তে নদী অবধি নিয়ে গেলেন। আমরা হুড়মুড় করে নদীতে নেমে পড়লাম আর ওনারা আমাদের পাহারা দিতে থাকলেন আর হাতিটির অবস্থান জেনে নিচ্ছিলেন। আমরাও হাতির ডাক শুনতে পেয়েছিলাম।

সারারাত বাসের ধকল সহ্য করে পরদিন বিশ্রামের সুযোগ না পেয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নদীতে নামতেই ঠান্ডা জল একমুহূর্তে সারা শরীরের ক্লান্তি দুর করে দেয়। ভুলেই গেছিলাম যে আমরা কোন বিপদের মধ্যে রয়েছি। স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে বনকর্মীদের পাহারায় জঙ্গল ছেড়ে বাইরে চলে আসি। এরপর দুপুরের খাওয়া সেরে অপেক্ষা করতে থাকি বাস ঠিক হওয়ার। সন্ধ্যে নাগাদ ঠিক হলে রওনা দিয়ে পরদিন সকালে ফিরে আসি কলকাতায়।

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই.....

গুরুপদ ঘোষ

দশঘরা, হুগলি

ভয়ানক রাত

স্নেহা মল্লিক

ডিসেম্বর মাস। শীতকাল। তখন আমাদের প্রাইভেট থেকে স্যার বলল যে নির্জনপুরে পিকনিক করতে যাওয়ার কথা। রবিবার সকাল বেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি আর আমার বন্ধু সুমন এবং আরো ২৫ জন মত এবং স্যার যাচ্ছিলাম। আমরা ওখানে গেলাম দুপুর বারোটা নাগাদ। গিয়ে ওখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা নদীর পাড়ে রান্না বসালাম। রাধুনী রান্না করছে। মেনু হল পোলাও, চিকেন কষা, সর্ষে ইলিশ, চাটনি, পাঁপড় , রসগোল্লা,দই ও পান। শুনেছি যে বনের গভীরে একটা রাজবাড়ি আছে। রাজবাড়িটি নাকি অনেক রহস্যময়। অদ্ভুত জিনিস ঘটে। তাই ঠিক হল যে আজ সন্ধ্যার পর আমরা রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব।বিকেল হতে না হতেই আমরা কাঠ,পাতা খুঁজে থাকার জন্য কয়েকটা তাঁবু খাটিয়ে নিলাম। সন্ধ্যা বেলা আমরা চা খেয়ে রাতের জন্য কিছু লুচি আর তরকারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাজবাড়ির পথে। পথে গভীর জঙ্গল তার উপর আবার শীতকাল। সব নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁর ডাক। টর্চের আলোয় ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না,শুধু গাছ আর গাছ। অনেকটা পথ যাওয়ার পর আমরা রাজবাড়ির কাছে এলাম।তখন বাজে নটা। রাজবাড়ির চারপাশ থেকে তখন রহস্য রহস্য গন্ধ আসছে। দেরি না করে আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে রাজবাড়িতে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হলাম।হঠাৎ রাজবাড়ির দরজাটা খুলতে অনেকগুলো বাদুর বেরিয়ে এলো। তারপর আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকেই কেন জানিনা আপনা আপনিই দরজাটা ক্যাঁচ-চ-চ-চ-চ করে বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমার খুব ভয় করছে। বাড়ির ভিতরে অনেক রাজ রাজাদের ছবি টাঙ্গানো আছে। আমরা ছবিগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার আর সুমনের পাশের একটা ছবি পড়ে ভেঙে গেল। আমরা ভয়ে ওদিকে টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম ওখানে দু তিনটে ইঁদুর ঘোরাঘুরি করছে। মনে হল ইঁদুর গুলোর জন্য ছবিটি পড়ে গেছে । তখন আমি আর সুমন যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি তখন মনে হল যে আমাদের সাথে কেউ যেন আসছে। উপরে উঠতেই মনে হল কেউ যেন খুব কাঁদছে। কিন্তু গিয়ে দেখি সেখানে কেউই নেই। হতে পারে ওটা আমাদের মনের ভুল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম যে আমার পাশ দিয়ে একটা ছায়া হেঁটে চলে গেল। তারপর শুনতে পেলাম কেউ যেন আমার নাম ধরে পিছন থেকে আমাকে ডাকছে। পিছন ঘুরে দেখতেই দেখি একটা রক্তাক্ত চেহারা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই। জ্ঞান আসতে আমি দেখি যে আমরা রাজবাড়ির একটা ঘরে আছি। সবাই বলাবলি করছে যে আমি কাল রাতে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে দুপুরের রান্না করা খেয়ে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে উঠে পড়লাম। কিন্তু কেন জানি না এখনো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সেদিনের ঘটনাটা আসে ও আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে রাজবাড়ির ঘটনাটা সত্য না কল্পনা ছিল। যাইহোক, হতে পারে সেটা সত্য না হয় কল্পনা। কিন্তু এখনো ওখানে রাতের বেলা কেউ যায় না। ভুল করে তুমিও কোনদিন ওখানে যেও না-না-না-না-না.....।

পত্রিকার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ঃ

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

মুক্ত গদ্য

একটি তারার আলো

সুচরিতা চক্রবর্তী

'' বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরে অন্তরালে এল মৃত্যু দূত চুপে চুপে ; জীবনের দিগন্ত আকাশে যত ছিলো দুঃখ স্তরে স্তরে, দিলো ধৌত করি ব্যথার দ্রাবক রসে, দারুন স্বপ্নের তলে তলে চলেছিলো পলে পলে ''

শ্রাবণ মাসের ২০ তারিখ। বৃষ্টিস্নাত শহরতলী থেকে যাচ্ছিলাম আলিপুর। গাড়ির কাঁচে জলের আলপনা বারবার ভেঙেছে গড়েছে কত কি চিত্র, কি বিচিত্র কর্ম প্রবাহে সকলেই ব্যস্ত। কার কার অগোচরে কে কে ভাবে কার কার কথা। ভিজে কাক চুপচাপ বসে আছে নিরাপদ ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপনের মাথায়। গাছেরা ঝুঁকে এলো আরো খানিক মাটির কাছে আরো খানিক মানুষের কাছে। গাড়িতে বাজছে আকাশবাণী কলকাতা। সেই আবেগ সেই নস্টালজিয়া। আকাশবাণী কলকাতা কে শোনে এখন ঠিক জানা নেই। এ মাস হারানোর মাস আবার এ মাস স্বাধীনতার মাস। ২২শে শ্রাবণ যা হারিয়েছি রেডিওতে চলছিলো তারই কথোপকথন। আকাশের দিকে চেয়ে আছি গাড়ির কাঁচ আটকে দিচ্ছে জলের ফোঁটা। তা দিক কিন্তু মন সে তো ভেসে গেছে ১৮৬১ সালের ৭ ই আগস্টে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন কালো মৃত্যুর কঠিন সে হাতছানি তার শিথিল হয়ে আসা শরীর তার আঙুল, তিনি মূর্ছা যাবেন, ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন ঈশ্বর। কে কার আঙুল ধরবেন ! আমার মন বিষণ্ণ হলো। আজ প্রবল বর্ষা। সেদিনও কি ধুয়েছিলো যত বেদনা যত দুঃখ? আমরা তো পারি না আটকে রাখতে আটকে থাকতে।

আমাদের এ শরীর টেনে বয়ে নিয়ে যাই মৃত্যু সুন্দরের দিকে।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি

জামালপুর পূর্ব বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাবতীয় প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ন করে চলেছে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি। সর্বদা মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে—

জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

পার্থসারথী দে	ভূতনাথ মালিক	পূর্ণিমা মালিক
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক	সহ-সভাপতি	সভাপতি

আডোনিস-সিরিয়ার কবিতা

তন্ময় কবিরাজ

একটা চেনা গল্প হতে পারত,যে গল্পের নাম হয়তো জসীমউদ্দীন বা সমর সেন।কিন্তু জীবন বড়ই অদ্ভুত। সময়ের সঙ্গে পালটে যায় সবকিছুই। তাই বাবার সঙ্গে মাঠে যাওয়া, বাবার পাশে বসে কোরআন শোনা,সেই ছেলেটাই হয়ে উঠলো আডোনিস। পুরো নাম আলী আহমেদ সৈয়দ আসবার। জন্ম সিরিয়ায়,সাল ১৯৩০। দ্যা গার্ডিয়ান তাঁকে বলেছিলেন,'' দ্যা গ্রেটেস্ট লিভিং পোয়েট অফ আরব ওয়ার্ল্ড।'' ১৯৫৪ সালে দামাস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে সিরিয়া সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দেন এবং তার জন্য তাঁকে ছয় মাস কারাদন্ড ভোগ করতে হয়। আডোনিস প্রাণখোলা,ধর্মনিরপেক্ষ একজন মানুষ।তিনি তাঁর মুক্ত চিন্তায় কবিতাকে নিয়ে গেছেন বিশ্বের দরবারে। চেনা ছকের বাইরে আরবের কবিতায় এসেছে অন্য গতি। প্রায় ২৯ টির মত কাব্যগ্রন্থ, ত্রিশটির কাছাকাছি সমালোচনামূলক লেখা তাঁর সৃষ্টিতে। আডোনিসের চিন্তা, কাব্যশৈলী ব্রিটিশ কবি এলিয়টের সঙ্গে তুলনীয়।২০০২ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন,''দেয়ার ইজ নো মোর কালচার ইন দ্যা আরব ওয়ার্ল্ড। ইটস ফিনিশড। উই আর এ পার্ট অফ ওয়েস্টার্ন কালচার বাট ওনলি আস কনজ্যুমার, নোট আস ক্রিয়েটরস।'' এখানেই রবীন্দ্রনাথ আর তিনি একই সুতোয় বাঁধা পড়ে যান। পশ্চিমের প্রতি অতি দুর্বলতার কারনেই নড়ে যাচ্ছে সংস্কৃতির ভিত,স্বকীয়তা হারাচ্ছে সভ্যতা। ভোগবাদী হচ্ছি আমরা, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারছি না কিছুই। অথচ এতদিনের পুরোনো ইতিহাস আমাদের ,তার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ নেই । আরব তো একটা রূপক মাত্র। গোটা সভ্যতা যেনো ধ্বংসের দিকে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তাঁর লেখায় ছিল দম্ভ আর বিশ্বাস যা একটা জাতির সজাগ মেরুদণ্ডের প্রতীক হয়ে দাঁড়াতে পারে।তিনি শিল্পের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর লেখায় তিনি বলেছেন,''আপনি একটি শব্দ বা চিত্রকর্মকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন না।'' দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাদিক জালাল আল আজম আডোনিসকে একজন স্বাধীনচেতা,প্রগতিশীল,আধুনিক মানুষ বলে সম্বোধন করেছেন। স্যামুয়েল হাজও তাঁর লেখা অনুবাদ করেন।তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা সিলেক্টেড পয়েমস্, মিহিয়ার অফ দামাস্কাস, দা ব্লাড অফ আডোনিস ইত্যাদি। তিনি লিখেছিলেন,''আই ইমাজিন এ পোয়েট ইন্টু ওহুস হিস্টরি পৌরস, ড্রিচিং হিস ওয়ার্ডস এন্ড পুলিং আট হিস ফিট।'' তাঁর ''একা জমি'' কবিতায় তিনি নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন, তিনি শব্দের সন্ধান করেছেন। কেউ নেই চারপাশে, মায়ার দোসর হয়ে শুধু মৃত্যু যেন শুয়ে আছে !

''পলাতক শব্দে আমার বাস
আমার মুখে নিঃসঙ্গতার অবয়ব
আমার মুখেই তার নির্বান

যদি তোমার নাম ধরে ডাকি
সে তো মায়াবী, আরও একা
যদিও সেই আমার মৃত্যু !''

আডোনিস সময়কে বুঝতে চেয়েছেন, সময়ের কাছে হেরে গেছে স্বপ্ন বাসনা। আহত মনের ভেতরে ভালবাসা নেই, কথা বলার মত কেউ নেই।আবার গুমোট চারপাশে পালাবার ঠিকানাও নেই।সে কথাই লিখেছেন কবি তাঁর ''আহত'' কবিতায় -

''চার্চের ঘণ্টায় অসহায় শব্দরা
তোমাকে যন্ত্রনা উপহার দেবো
যে পাথর ভাঙা ছিল
আজ ছাই হয়ে উড়ে গেছে বহুদূর''

১৯৫৭সালে সিরিয়া লেবানিজের কবি ইউসুফ আল খান সম্পাদিত ''মাজাল্লা'' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশ হবার পরেই বিতর্কের জন্ম হয়। ১৯৮০ সালে গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্সে চলে যান। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে নয়া সুফিবাদ। হেইথাউস লিখেছিলেন,''আই হোপ ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট হাউ পোয়েট্রি রেসপন্ডস ওর এক্সিস্টস উইথ ওয়ার্ল্ড ইভেন্টস।'' কবিতাকে যদি বিশ্বের দরবারে

নিয়ে যেতে হয় তাহলে কবিতার ভেতর থেকে খুলে ফেলতে হবে অলংকারের মোড়ক, আঁতেলপনা।কবি হয়ে উঠবে অসহায় মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। কবিতার ভেতর থাকবে না কবির গর্ব, কবির সার্থকতা থেকে যাবে, কবি মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে। কবি বিক্রি হয়না,কবিতা বিক্রি হয়। কবিতার মধ্যে কবির আর্তনাদ। ''একটিও তারা নেই'' কবিতায় কবি আডোনিস ও বৃটিশ কবি ম্যাথু আর্নল্ড এক সারিতে। আর্নল্ড ডোভার বিচে দাঁড়িয়ে উলংগ নুরি দেখে ছিলেন,আর আডোনিস দেখছেন গুহার ভেতরে। সংশয় এতো গভীর যে এতদিনের বিশ্বাসে ফাটল ধরাচ্ছে, আলগা হচ্ছে বাঁধন। অবিশ্বাসের পথে জীবন আর কতটা পথ হাঁটতে পারে, এখন সেটাই দেখার।

''উলংগ পাথরের মত সে
গুহার ভেতর তার চিৎকার
ক্রমশ হালকা হচ্ছে
পৃথিবীকে ঘিরে বেঁচে থাকা।''

কবি দেখতে পাচ্ছেন দূরে ধ্বংসের হাতছানি। সূর্যের মেটাফরে আলো ঢেকে যাচ্ছে গভীর অরণ্যে,অন্ধকারে সৌন্দর্য ম্লান,ফিরে আসে আতঙ্ক।কবি জানেন , সভ্যতা এভাবেই চলবে শেষের পথে কারন আমরাই সরে গেছি মূল থেকে।তাই প্রেম বেঁচে থাকলেও প্রেমিক হয়তো বাঁচবে না আর।তবু অস্থির সময়ে নবজাতকের স্বপ্ন দিন বদলাবে একদিন, শান্তি ফিরবে। ''মানুষের গান'' কবিতায় কবি লিখেছিলেন,

''আমিও দেখেছি সূর্য
তোমার কালো হাতের গহ্বর
গভীর বনে মিশে যাচ্ছে ইচ্ছেরা
ঝুড়ির ভেতর রাত্রি
এভাবেই চলছে শহর
তোমার সামনেই আমার অস্তিতে ক্ষয় -
আমি দেখেছি
তোমার মুখে ক্ষুধিত শিশু
তবু আশাবাদী
পড়ে থাক ফুলের কুঁড়ি।''

কবি নস্টালজিক। মাঝে মাঝে ফিরে যান শৈশবে।বুঝতে পারেন শৈশব আর পরিনত বয়সের বিস্তর ফারাক। তবু মনে হয়, অতীতের স্মৃতি যেন আজও ''ব্লিস অফ সলিটিউড'', নিঃসঙ্গতার আশীর্বাদ হয়ে পাশে দাঁড়ায়। তিনি সেদিনের দিনগুলোকে সমান্তরাল নদীর সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি জানেন এসবও একদিন ঝরে যাবে,তবু যত দিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন স্মৃতির সুখ ভোগ করতে চান কবি। তাঁর ''শব্দ শুরু'' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

''শৈশবে যখন প্রথম এসেছিল
নীরবতার পাশে হেঁটে যাওয়া
সঙ্গে প্রবাহিত অদ্ভুদ এক নদী

আমরা জেনেছি নিজেদের
কখনও কাছে, কখনও দূরে
সবুজ গাছের মিছিলে
ভিজে যায় সময়ের স্রোত

শৈশব
এতো আপন করে নিল
কি আর তাকে বলবো বলো ?''

শান্তির খোঁজে তিনি বারবার ছুটে গেছেন শৈশবে। ব্রিটিশ কবির ব্লেকের মত ইনোসেন্স হারিয়ে এক্সপেরিয়েন্স বড়ো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রূপকহীন সহজ ভঙ্গিমায় আডোনিস তাই ছেলেবেলার সেই পাগলামোকেই মনে করছেন। ''শৈশবের উদযাপন'' কবিতায় কবি লিখছেন,

''মনের বালিশে শুয়ে
শরীর জুড়ে যে ধারণা ছিল
সেদিন নিজের সঙ্গে কথা হয়েছিল
সে কথা লিখেছি লাল অক্ষরে
লাল সেতো সূর্যের সিংহাসন।''

মনের সরলতায় তিনি দেখেছেন,দিন যদি সূর্যের সিংহাসন হয় ,তবে রাত তার মায়াবী প্রদীপে ভরিয়ে দেয় চারপাশ। সূর্যই বোধহয় মাঝে মধ্যে আড়ালে চলে গিয়ে পৃথিবীকে মুড়ে ফেলে কুয়াশার চাদরে, এ যেনো ওয়ার্ডসওয়ার্থের ''আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ'' কবিতার সেই সূর্যের চাদরে ঢেকে যাওয়া লন্ডন শহরে প্রতিফলন।কবি বিশ্বাস রাখেন, কবিতাই পারে ভাঙা পৃথিবীকে আবার জোড়া লাগাতে। তিনি ধ্বংসের সাক্ষী

থাকছেন। সভ্যতার ভাঙন ধরেছে, ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে সব। ''মরুভূমি'' কবিতায় কবি লিখেছিলেন,

''সব রাস্তায় রক্ত
বন্ধুরা কথা বলে হিংসায়
শুনশান আকাশ
শুধু ইতিউতি তারাদের গহ্বর।''

তাঁর ''দৃষ্টি'' কবিতাতেও সেই ধ্বংসের ছায়া পড়েছে।তিনি দেখছেন,

''শহর পালাচ্ছে
আমিও তার রাস্তা খুঁজছি চারদিকে।''

কবি নিজের মধ্যেই রয়ে যান কারণ বাইরে ঝড়, রাজনৈতিক অস্থিরতা।সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যান প্রকৃতির কাছে। তিনি দার্শনিক নন,কিন্তু পাঠক তাঁর কবিতায় পেয়ে যায় জীবনের দর্শন যা সীমান্তের সব বাধা পেরিয়ে শুধু মানুষের কথা বলে।

''আমি সমুদ্রের কবিতা পড়ছি
আমি যে ঘণ্টা শুনছি
তার ভেতর শামুকের খোলস।''

এতো নিঃসঙ্গতা যে কেউ আশার গল্প লেখে না। তাই ওডিসিকে উদ্দেশ্য করে কবি লেখেন,

''তুমি শপথহীন পৃথিবীতে থেকে যাবে
তুমি থেকে যাবে না ফেরার দেশে।''

কবি দেখছেন,

''ক্ষয়ের আগুনে ছারখার সভ্যতা
মমি হয়ে গেছে সময়।''

আন্তর্জাতিক নাজিম হাইকমেট পোয়েট্রি আওয়ার্ড, সিরিয়া লেবানন বেস্ট পোয়েট আওয়াড তাঁর ঝুলিতে।পাশাপাশি, প্যারিসের স্টিফেন মাল্লার্মে একাডেমির সদস্য পদ পান তিনি। তবে আডোনিসের কাজ যেনো আরো কিছু দাবি করতে পারে। আরোবিয়ান বিজনেস পত্রিকা তাঁর চিন্তা কাব্যিকতায় তাঁকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বলে উল্লেখ করেছেন। সভ্যতার এই চরম সংকটে তাই তাঁকেই দরকার । কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন,

''এসো মেঘ ছুঁয়ে বসি
আজ বহুদিন পর; এই
হলুদডোবানো সন্ধেবেলায়।''

শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

পার্থ পাল

শিক্ষক, তারকেশ্বর মহেশপুর হাইস্কুল

শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সৌমেন বসু

সভাপতি - ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

রম্যরচনা

এসো সুন্দর হই

সজল চক্রবর্তী

কার না সাধ জাগে সুন্দর হতে ! আর 'চন্দ্রশেখর'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখেছেন ,''সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'' সুন্দর হতে চায় সকলেই। শুধু কি তাই ! সুন্দরকে কেউই ছেড়ে যেতেও চায়না।সুন্দরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতে চায়।

তাই তো রবীন্দ্রনাথ লেখেন , ''মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'' আর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার লেখেন এবং শ্যামল মিত্র গেয়ে শোনান,''এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায়।'' কাজী নজরুল শোনান,

''তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়,সে কি মোর অপরাধ ?''

সুন্দরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা চিরন্তন, চিরকালীন।

John Keats তাঁর 'Emdymion'- কবিতা'য় লেখেন,

'A thing of beauty is a joy for ever. '

অর্থাৎ সৌন্দর্য-লব্ধ আনন্দ চিরন্তন,চিরকালীন।

W.H.Davies "াঁর 'Leisureó- কবিতা'য় লেখেন,

"No time to turn at Beautyós glance.
And watch her feet– how they can dance."

অর্থাৎ সৌন্দর্য যদি উপভোগ-ই না-করতে পারি, তবে এই জীবনের মানে কী ?

অর্থাৎ মানুষ চিরকাল সুন্দরের পিয়াসী। এবং এ-কারণেই, স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে এসেছে।তাই মানুষ প্রসাধন- সামগ্রী ব্যবহার করেছে।

ব্যবহার করেছে কাজল, মূলতানী মাটি,হলুদ,চন্দন মায় হাল আমলে স্নো,পাউডার,ক্রীম ফেশিয়াল আরো কত কিছু !

এই প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা পরিশ্রমের এবং ব্যয়বহুলও বটে।

...তা, আমারও একদিন 'সুন্দর' হবার
সাধ জাগলো মনে,যেমন 'কুঁজো'র-ও
চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে হয়।

তা, আমি একটা সহজ ও 'শর্টকাট' পন্থা অবলম্বন করলাম।একদিন আমার বাসায় চায়ের সান্ধ্য-আসর বসালাম।আমার সব বন্ধুরাই নিমন্ত্রিত।

কেউ -কেউ আমার চে' সুন্দর, তবে বেশিরভাগ-ই আমার চে'কম-সুন্দর !

আলোচনা চলছে। হঠাৎ আমি জেনেবুঝেই, সৌন্দর্যের প্রসংগে চলে এলাম।

আর বললাম, আমাদের মধ্যে হাবুল (যে আমার চেয়ে কম সুন্দর !) কে দেখতে খুব সুন্দর।

সবাই-ই সায় দিলো।

তৎক্ষণাৎ আমি আস্তিনের ভিতর থেকে আমার তুরুপের তাস'টা বের ক'রলাম,

হাবুল সুন্দর, তবে আমিও সুন্দর !

সবাই সমস্বরে বলে উঠলো --

''তুই অবশ্যই সুন্দর !!''

আমি সুন্দর হইলাম এবং যার-পর-নাই আনন্দিত হইলাম।।

'জলই জীবন"

আসুন শপথ নিই, অযথা জলের অপচয় বন্ধ করি।

জারা হটকে জারা বচ্ কে

ড.সুপ্তি সরদার

জীবনে এই প্রথমবার আমার কলম লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমায় প্রশ্ন করলো, নিজের অকৃতকার্যের কাহিনী এভাবে ফলাও করে বলাটা কি ঠিক হবে ? আমি তাকে বীরত্ব দেখিয়ে বললাম,সময় পেরিয়ে গেলে অকৃতকার্যকেই কৃতকার্য বলে মনে হয়,ব্যথাও হাসির জোগান দেয়। আর এর নাম জীবন। অতএব তুমি আগে বাড়ো।সালটা ২০০৭।দুই ছেলেকে পার্কস্ট্রীটের স্কুল থেকে মেট্রো ধরে যাবার পর পুরো রাস্তাটা পায়ে হেঁটে গিয়ে ওদের নিয়ে আসতাম।ওটাই ছিল দৈনন্দিন রুটিন।কিন্তু একদিন রুটিন মেনে মেট্রো থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হচ্ছি,গাড়িগুলো সব চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় দেখি সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেছে আর গাড়িগুলোও তখন উন্মত্তের মত আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আর ঠিক সেইসময় আমার হাঁটু গেল বিকল হয়ে।আমার হৃদপিন্ডটা মনে হল আমার হাতে উঠে এল ! কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরে ঠিক করলাম এবার গাড়ি কিনতেই হবে। মারুতি কোম্পানীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতেই ঘরে এজেন্ট এসে কথা বলে সব বন্দোবস্ত করে দিল।অতঃপর গাড়ি এসে গ্যারেজে ঢুকলো।কিন্তু চালাবে কে ? ড্রাইভারের খোঁজ করতে হল।ড্রাইভারও এল।সেদিন রাতে আমি স্বপ্নে দেখি আমার প্রেমিক রাজেশ খান্নাকে পাশে বসিয়ে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। ঘুম ভাঙতে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।ভাবলাম স্বপ্নটাকে সত্যি করে দিলে মন্দ হবে না।একদিকে পেট্রল পকেট কাটছে,ড্রাইভার আমার মাইনে থেকে তার মাইনে কাটছে। ব্যাঙ্ক ইএমআই কাটছে।এই কাটাকাটির চক্কোর থেকে বেরোতে গেলে আমার গাড়ি চালানো শেখা উচিত। এরপর শ্যামবাজার মোটর ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গাড়ি চালানো শেখা শুরু হল।শিক্ষা শেষে পরীক্ষাতে বসতে হল। পরীক্ষক গাড়িতে বসে বলল,চালান।ব্যাস,আমার হৃদকম্পন এমন বেড়ে গেল যে গাড়ি চার বার ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ তুলে থেমে গেল।আমি ভাবলাম আমার হৃদপিন্ডটাকে থামাই কি দিয়ে।তা সে কাজটা পরীক্ষকই করে দিলেন।বললেন, আপনি ফেল করেছেন।জীবনে এই প্রথম একটা ক্ষেত্রে আমায় কেউ বলল আমি ফেল করেছি।আর কি করবো।ব্যর্থ মনোরথে বাড়ি ফিরতে ছেলেরা শুনে কাতর হয়ে বলল, মা,তুমি ফেল করে গেলে ! এতদিন শুনেছি সন্তান ফেল করলে মা কাতর হয়ে পরে,সেদিন মা ফেল করতে সন্তানদের কাতরতা দেখলাম।আর আমার স্বামী যিনি সারা জীবন আমার সমস্ত কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে এসেছেন,তিনি এতবড় সুযোগ পেয়ে প্রশংসা করবেন না তাই কখনও হয় ! তিনি বললেন, একটু গুগল সার্চ করে দেখো,তোমার নামটা এতক্ষণে মনে হয়,গিনেস রেকর্ড বুকে উঠে গেছে।গাড়ি চালানোর পরীক্ষায় কেউ ফেল করে।যাক গে,হাল ছাড়লাম না। ভাবলাম লাইসেন্সটা যা হোক করে জোগাড় করি,তারপর বাড়ির ড্রাইভারের কাছে ভাল করে শিখবো। আবার পরীক্ষায় বসলাম। এবার পরীক্ষকের হাতে ২০০ টাকা ঘুষ দিয়ে বসলাম।এবার গাড়ি এক দুবার ঘ্যাঁত ঘ্যোঁত করেও একটু এগোলো। পরিক্ষক অনিচ্ছা সত্তেও পাশ করাতে বাধ্য(২০০ টাকা নিয়েছেন যে) হলেন,আর বললেন,পাশ করিয়ে দিলাম বটে,কিন্তু আপনি রাস্তায় গাড়ি চালাবেন না। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিরস্ত করে বললাম,না না স্যার, আমি শুধু স্বপ্নে চালাবো।এরপর হাতে লাইসেন্স পেলাম।আমার ড্রাইভারকে বললাম তোমাকে আরো কিছু টাকা বেশি দিচ্ছি তুমি আমায় গাড়ি চালানো শিখিয়ে দাও ।ড্রাইভার রাজি হয়ে গেল। সেদিনটা ছিল বিশ্বকর্মা পুজোর দিন।আমাকে আমার ড্রাইভার নিউটাউনের রাস্তায় নিয়ে গেল।আমি চালকের আসনে বসলাম।কিন্তু চালাবো কি ! সামনে খোলা আকাশ জুড়ে উড়ছে নানান রঙের ঘুড়ি !আমি আমার ছোটবেলায় পৌঁছে গেলাম। দাদা ছাদে ঘুড়ি ওড়াতো, আমি হাত বাড়িয়ে বলতাম,আমায় একটু ওড়াতে দে দাদা।ও বলতো, যা এখান থেকে তোর হাতে দিলে ভোকাট্টা হয়ে যাবে। দাদাই এখন ভোকাট্টা হয়ে গেছে। আমি স্থান কাল পাত্র ভুলে বলে বসলাম, সোন্টু (ড্রাইভার) দ্যাখো দ্যাখো কত ঘুড়ি উড়ছে ! সোন্টু তখন শিক্ষকের মত গম্ভীর গলায় বলল, আপনি এখানে গাড়ি চালাতে এসেছেন ম্যাডাম ঘুড়ি ওড়াতে নয়।বুঝলাম, এ আমার কাজ নয়। বাড়ি ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হল গুরুদেবকে দেখছি। গুরুদেবের বাণীগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করছি- শোনো বৎস,সব কাজ সবার জন্য নয়।তোমার মত গাড়ি কিনে সবাই যদি চালাতে আরম্ভ করে তবে বেকার সমস্যা কি করে মিটবে ! আবার সিনেমায় ঐরকম গান কি আর শোনা যাবে - আরে কেয়া শরম কি বাত, ভদ্দরঘরকা লেড়কি ভাগে ডেরাইভার কি সাথ ! তুমি যা অন্যমনস্ক এবং যে মানসিকতার, তোমার গাড়ির চাকার তলায় একটা কুকুর মরলেও তুমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।অতএব তুমি আর গাড়ি চালিও না। আমি তখন কুকুরের মত কুঁইকুঁই করে কেঁদে বললাম, তাহলে আমার স্বপ্নের কি হবে ? রাজেশ খান্না যে আমার গাড়িতে চড়বে বলেছে ,আমি যদি গাড়ি না চালাই তাহলে ! গুরুদেব হেসে বললেন,তুমি একটা ঠ্যালা গাড়ি কিনে রাজেশ খান্নাকে বসাও আর হিন্দী মে গানা গাও - জারা হটকে জারা বচ্ কে ইয়ে হ্যায় সুপ্তি মেরি জান !

কবিতা ও ছড়া

খবর পারে.....
সুনীতি মুখোপাধ্যায়

খবর পারে অন্ধকারেও চলার পথটা দেখিয়ে দিতে,
খবর পারে নৌকোটাকে সঠিক ঘাটে ঠেকিয়ে দিতে।
খবর পারে সুর-হারাদের মনের বাঁশি বাজিয়ে দিতে,
খবর পারে অলঙ্কারে নতুন সাজে সাজিয়ে দিতে।
খবর পারে সবুজ মাঠে বৃষ্টির মেঘ উড়িয়ে দিতে,
ছিন্ন-হওয়া মনের সাথে আরেকটা মন জুড়িয়ে দিতে।
খবর সোজাসুজির পাতায় সেই খবরই চাই,
যে খবরের মধ্যে কোন বিবাদ-বিভেদ নাই।

খবর পারে মেঘ-মিছিলে খরার আকাশ ভরিয়ে দিতে,
মন্দটাকে ছন্দে গেঁথে দ্বন্দ্বটাকে সরিয়ে দিতে।
গানের ভাষায় নবীন আশায় বন্ধ দুয়ার খুলিয়ে দিতে,
দুঃখে-থাকা মানুষগুলোর ব্যথার কথা ভুলিয়ে দিতে।
খবর সোজাসুজি তে তাই তেমন খবর চায়,
যে খবরের সুরে মানুষ আলোর গানই গায়।

খবর পারে মরুভূমির আগুন -বাতাস থামিয়ে দিতে,
খবর পারে অহঙ্কারীর শিরটা নীচে নামিয়ে দিতে।
খবর পারে গোমড়ামুখে হাসির সে ফুল ফুটিয়ে দিতে,
এক দৌড়ে পার হওয়া সেই ঘূর্নি হাওয়া ছুটিয়ে দিতে।
খবর পারে হতাশাতেও আশাবরীর সুর বাজাতে,
খবর পারে শূন্য-হওয়া ফুলদানিতে ফুল সাজাতে।
ধাঁধা তো নয়,খবর সোজাসুজিই সেটা বলতে পারে,
নতুন হাওয়ার ঝলক এনে নতুন পথে চলতে পারে।।

খাঁটি ভূত
বিজন দাস

হট টিমাটিম,হুট টিমাটিম,
তিনটে ভূতের ছানা,
একটা খোঁড়া একটা কালা
একটা হল কানা।
খোঁড়া ভূতের সখ
ঠিক করে সে ছক,
এভারেস্টের চুড়োয় উঠে
নাচবে সে কথক।

মনের ভিতর ঠাসা
কালা ভূতের আশা,
এই পৃথিবী ছেড়ে গড়বে,
মঙ্গলেতে বাসা।

কানা ভূত খুব জোরে
বললেন কালই ভোরে
সাতটা সাগর পাড়ি দেবেন
তিমির পিঠে চড়ে।

বিশিষ্ঠ সব ভূত
জানালেন নাই খুঁত
ওদের ভিতর খাঁটি ভূতের
গুন গুলো মজুত।

কবিতা, ছড়া ও গল্প

অনলাইন

সুব্রত মিত্র রানা

অনলাইনে
চিনি আসছে
চাল আসছে
ডাল
আর-যা কিছু
প্রয়োজন
মুদিখানার
মাল
চৌদিকে চৌ
রাস্তা গুলায়
থমকে বাইক
খানা
আর কত দিন
থাকবে বেঁচে
পাড়ার মুদি
খানা

আমি দৌপদী নই

অরুণকুমার মান্না

গ্রামের সরু আলপথে সন্ধ্যা নামে একাকী
সদ্য সাদা থানের লাজুক মেয়েটা হরিণি,
কানে কানে কথা ভাসে গোপনে গতরখাকি
সন্ধ্যাতারা আলো দ্যায় রোজ বলে, ওকে চিনি।

ঘন রাতেরও নিজস্ব একটা সাজ আছে
কাজলবলয়ে ঘোরেফেরে হাজার জোনাকি
আঁচল ধরে শান্ত আলোর স্রোতে তারা নাচে
ছোট- ছোট- আরো জোরে জীবন এখনো বাকি!

হরিণি ছোটে সরল শক্তি পায়ে বাধাহীন
ক্রমশ বাড়ছে গতি, বুকের দুয়ার খোলা
সাদা থান যেন পতাকা এ শরীর স্বাধীন
থামবো না কোনদিন আর আমি পথভোলা!

ওইতো আলোর রেখা,ওইতো পুবের পিতা
সূর্য ডাকছে কাছে থামো আরও শক্তি চাই,
হে অগ্নি, আর দেরি নয় জ্বালো আমার চিতা
আমি দৌপদী নই গো শুধু একমুঠো ছাই !

আমার শরৎ

বিজুরিকা চক্রবর্তী

শরৎ এসেছে শরৎ এর মত করে,
আমিও উঠেছি আমার মতন ভোরে;
কাশের দোলায় হৃদয় উঠে্ছ মেতে-
গাছের তলা ভরে আছে শিউলিতে,
এক এক করে কুড়িয়ে নিচ্ছি সব..
চারিদিকে নীলকণ্ঠের কলরব;
নতুন বস্ত্রে মন করে আনচান-
ভোররাতে আজ গায়ে দেবো এই থান,
আগমনী সুর বাজবে যখন ভোরে-
দিন গুণবো আবার নতুন করে,
এক.. দুই.. তিন.. বাজবে আবার ঢাক,
কাঁসর ঘন্টা আর মঙ্গল শাঁখ,
ধূপ-ধুনোর ওই গন্ধে ভরবে বুক,
তখন আমার অসীম অপার সুখ;
প্রসাদ খাবে একশ-হাজার জন,
প্রচুর থালা কুড়োবো তখন,
এত্ত কাগজ এই সময়েই হয়!
আরো একটা থান পাব নিশ্চয়,
সেই শাড়িটা আস্ত থাকবে বেশ-
এটাও ভালো, ছেঁড়া নয় বিশেষ;
আর তার সাথে ভোগ টাও পাবো রোজ!
জঞ্জাল মাঝে কেউ করবে না খোঁজ;
দেবীর মুখটা ঘামতেল পিচ্ছিল-
মা বলতো আমার সঙ্গে মিল।

কবিতা ও ছড়া

প্রতিবেশী

নাজমুল কবির

প্রতিবেশীর প্রতি কেহ বেশি দুর্বল হলে,
বেশি ক্ষতি প্রতিবেশী করে কলে বলে।
প্রতিবেশীর দুর্বলতা প্রতিবেশী জানে,
দিনে রাতে নষ্ট ছবি আছে কোন মানে !

হজ্জে গিয়ে হাজ্জি হয়ে বেপোরোয়া চলে,
অণুক্ষণে ভাবের মনে কতকিছু বলে।
শয়তানরূপী প্রতিবেশী আপন খেয়াল বশে,
প্রতিবেশীর ঢরম ক্ষতি করে বেড়ায় যশে।

সত্যিকারের প্রতিবেশী নিজের সম্মান রেখে,
প্রতিবেশীর ভালো মন্দ সকল সময় দেখে।
শয়তান রূপী প্রতিবেশী কাছের মানুষ হলে,
তারাই বেশি ক্ষতি করে নানান কূটকৌশলে।

Adobe Photoshop Clip Image is too big to be exported

প্রতিবেশীর ভালো দেখবে প্রতিবেশী হয়ে,
সমাজ সংসার ভালো হবে প্রতিবেশীর জয়ে।
সবাই যেনো প্রতিবেশীর ভালো দিকটা বলি,
পরোপকার করে সবাই হাত মিলিয়ে চলি।

পরম্পরা

তপন কোলে

দেখতে দেখতে ঘন বর্ষা চলে যাবে
তোমার চোখের সামনে দিয়ে ঢেউ খেলানো জল
তারপর তুমি আমাকে ভুলে যাবে আমিও তোমাকে,
হুহু বাতাসের মতো একদিন তুমি আমার জন্য কাঁদবে
যেমন আমি তার জন্যে কত সহস্র বর্ষায়
তুমি আমার জন্যে বেদনাপীড়িত হবে
যেভাবে আমিও স্মৃতিতাড়িত হই।

ভোলার স্বপ্ন

সুজন দাশ

ভোলার বাড়ির খোলা আকাশ চালের ফুটোয় যায় যে দেখা,
অভাব কষ্ট রাঙায় দুচোখ এ যেন তার কপাল লেখা!
মা মরেছে হওয়ার পরে পায়নি মায়ের ভালোবাসা,
পালতে দিল যাদের ঘরে অভাব তাদের ছিল ঠাসা!

বাপ মরেছে মায়ের শোকে বুদ্ধি ভোলার হয়নি পাকা,
বাবার ছবি হয়নি দেখা নেই মনে তাঁর ছবি আঁকা।
যাদের ঘরে প্রতিপালন সেই বাবাটাও নেই বেঁচে আর,
সবাই তারে কয় অপয়া পায়না ভোলা দোষ কিছু তার!

লেখাপড়া হয়নি শেখা ভাত জোটানো কষ্ট যাদের,
এমনতর ভাবনা ভাবা বিলাসিতা নয় কি তাদের?
চাকরি নিল চা'র দোকানে কিল লাথি রোজ এমনি জোটে,
আশার মাঠে হয়না ফসল ভাগ্য সহায় হয়না মোটে!

স্কুলে যার থাকার কথা খাচ্ছে সে ভাত কর্ম করে,
টানছে বোঝা পরিবারের সাহস রেখে যাচ্ছে লড়ে!
নিজের মাকে পাইনি বলে আঁকড়ে ধরে যেই মা আছে,
দেখলে হাসি-মায়ের মুখে রয় না যে দুখ ভোলার কাছে!

মা বেটাতে কাঁদে হাসে ফিরলে ঘরে কাজের শেষে,
স্বর্গ তখন একটু হলেও ভোলার বাড়ি দাঁড়ায় এসে।
মাকে ছাড়া কে আছে তার মা যেন তার আশার বাতি,
হাজার স্বপ্ন ভোলার মনে কাটবে কবে আঁধার রাতি?

কবিতা ও ছড়া

হৃদয়ের আলপথে

তুষার ভট্টাচার্য

কোলাহলহীন নিঝুম জোছনা রাত্তিরে
রাতপরীদের শান্ত গান ভেসে আসে
বকুল বাতাসে;
আর তখনই
অবাধ্য যৌবনের অলীক মায়াজাল আমাকে টেনে নিয়ে যায়
ভালবাসা সংশয়ের পাঠশালায় ;
শীত প্রথা ভেঙে নিষেধের সমস্ত বেড়াজাল ডিঙিয়ে
আগুন জ্বালাতে ইচ্ছে করে
রাতপরীদের ভূগোল শরীরে।

কবিতা সত্যিই সৃষ্টি হয়

সুফি রফিক উল ইসলাম

কবিদের ঝোলা কবিতায় ভরা
সেখানে আপাতত নেই কোনো খরা।
বার্ষিক যান্মাসিক ত্রৈমাসিক
মাসিক পাক্ষিক সাপ্তাহিক -
কখনো আবার দৈনিক দুবেলা থেকে চারবেলা
কবিরা কবিতায় করে ছেলেখেলা।
মুঠোয় ভরা কবিতার ঝোলা
হাতে হাতে কবিতারা কাছা খোলা।
চাঁচাছোলা কবিতারা মুঠোফোনে ঝুলে যায়
দাপুটে কবিদের কবিতার ঝোলায়।
তবুও কবিতাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়
কবিতা কি বলতে চায় স্পষ্ট নয়।
দুয়ারে দুয়ারে কবিদের সমাগম
আসরে বাসরে কবিতার পয়গম।
তবু কতোটা এগিয়েছি বলো, ক'কদম
যদিও ঝোলা ভর্তি কবিরা চলেছে হরদম !
কবিরা কি জানাতে চায় স্পষ্ট নয়
কবিতা সত্যিই কি ভালোবেসে সৃষ্টি হয় ?

সময়ের নিরিখে

ডাঃ সেখ সাবের আলি

সেই চেনা মুখ, কোথায় যেন দেখেছি
ঠিক মনে পড়ে না,
আবছা আলোয় গোধূলি বেলায় কনে দেখা
যেন, সবুজ ঘাসে শিশির কণা।
পদ্ম পাপড়ির মত টানা টানা চোখ
জলঢেউ দোলায় শালুক ফুল,
ঝুলন্ত কালো চুলের গোছা কটী পরে
থমকি থমকি দোলে কানে দুল।
শাড়ির ভাঁজে লুকানো আছে নারীত্ব ভূষণ
জৌলুস লাল টুকটুকে ঠোঁটে,
টিকালো নাকের উপরে আছে চন্দ্রচূড় ললাট
টিকলী ঝুলানো যেন ঝিঙ্গের বোঁটে।
ভুলে গিয়েছিলাম, চাওয়া পাওয়ার বিপাকে পড়ে
সময়ের নিরিখে সেই চেনা মুখ,
আকাশের নীচে ভালোবাসা মাখানো গোলাপ কলি
নতুন করে ভরিয়ে দিল বুক।
সেই চেনা মুখ অজান্তেই এলো সম্মুখে
আচম্বিতে দেখা হলো রাস্তায়,
থমকে গেল সময়, চলার পথে কিছুক্ষণ
হিসাব মিলাতে জীবন খাতায়।
সময়ের নিরিখে পরিবর্তন হয় জীবনের হিসাব
সকাল দুপুর গড়িয়ে এলো বিকাল,
সূর্য গেল পাঠে সময়ের অঙ্ক মেনে
সময়ের নিরিখে আনতে সকাল।

কথা কিছু

তীর্থঙ্কর সুমিত

ব্যাপারটা কিছু অস্বাভাবিক লাগলে
পরিবর্তন করবো নিজেকে
স্বাভাবিক ভাবে যে কতগুলো হাত
দেখা যাচ্ছে,
তার একটা ছবি আঁকা আমার কাছে
সিগারেটের ধোঁয়ায় ব্যর্থ শহর
কিছু হাল এখনও টানা হচ্ছে
মাঝিদের নৌকা আর
ভাটার তৎপরতা
এক আকাশ খুশি নিয়ে
মা রান্নাঘরে উনুন জ্বালিয়েছে।

কবিতা ও ছড়া

চাঁদের হাসি

রাসমণি ব্যানার্জী

চাঁদ হাসছে পুব আকাশে দ্বাদশীর এ রাতে
বইছে হাওয়া মিষ্টি সুরে দেখেছি খাতে খাতে।
জ্যোৎস্না আলোয় আলোকিত আমার পৃথিবী
হাসছে আকাশ হাসছে পাতা হাসছে মাধবী।
সারা দুপুর তপ্ত রোদে জ্বালা জ্বালা শরীর
রাতের বেলা হাওয়ার তালে দোলে পাখির নীড়।
ছাদে বসে আকাশ দেখি মাইক বাজে সুরে
আজকে যে ভাই কালীপূজা কাছে এবং দূরে।
চাঁদের গায়ে গর্ত দেখি জলে চাঁদের ছায়া
কে করেছে গর্ত সেথায় হচ্ছে দেখে মায়া।
জুঁই এর সুবাস আসছে নাকে আরো কত কিছু
চাঁপার সাথে বেলের সুবাস ছাড়ে না তাও পিছু।
চাঁদের আলো মেখে আমি দেখতে যাবো কালী
ঢাকের তালে মাতোয়ারা উড়ছে ধুলোবালি।
বাজির সাথে চাঁদের আলো মিশে একাকার
নীচে নামি মাকে আমি দেখতে যাবো এবার।

চাই বা না চাই

নীলমাধব প্রামাণিক

আমরা যারা সম্প্রীতি চাই
এবং যেচে দু- হাত বাড়াই
এগিয়ে যাই পাশে দাঁড়াই
জাত বে জাতের গণ্ডী ছাড়াই।

আমরা যারা মানুষকে চাই
জীবন দিয়ে মানুষ বাঁচাই
একটা দুটো যা খুঁজে পাই
সত্যি করের মানুষকে চাই ।

আমরা যারা সখ্যতা চাই
যেখানে যাই বন্ধু পাতাই
এসব কথায় যা ভাবো তাই
সত্যি সত্যি মানুষ তো চাই ।

আমরা যারা মিলন টা চাই
তারাই তো সব মানুষ রে ভাই
সত্যি এখন মানুষ টা চাই
আসবেই সে চাই বা না চাই ।

সুচরিতাসু ১৭

(একটি দুঃখী মেয়ের আলোয় ফেরার সাতকাহন)

বিদ্যুৎ ভৌমিক

সবুজের সীমারেখা থেকে ছুটতে ছুটতে চলে আসে শব্দ মন্ত্র ঘ্রাণ
রূপোলি জোছনায় পথ চিনে নিতে আবার ভুল হ 'লো ,
গ্রামীণ ঘাস লতাপাতা আর চিরায়ত নির্জনতার মধ্যে ভাসমান
জোছনা খেতে খেতে আর কতদিন কাটাবে বলো ?
তোমার ত এখন জোছনা দেখে পালিয়ে বেড়ানোর কথা !
আহা , আবেগের নরম শিশিরে ভালোবাসার ফুল ফোটানোর
তোমার কী ভীষণ আকুতি ছিলো !
তারচে ' বুকের নিচের সোনালি কৌটোয় নির্জন নিঃসঙ্গ হৃদয়ের গভীরে
আত্মবিশ্বাসের সেই ভোমরাকে সাহসের সঙ্গে পালন করো , দুধেল জোছনার
মতো নরম ঘাসের ওপর পা রেখে রেখে দৃঢ় বিশ্বাসের বেদীমূলে নির্বিকার
দাঁড়িয়ে পুরনো মূল্যবোধের শেকড় সমূলে উপড়ে ফেলে অপরের জন্যে
মহানুভবের কপাট হাট করে খুলে অন্ধকারে নদী পেরোনোর সাহসী
সংকল্পে ভেতরকার দুঃখগুলোকে কবিতার শব্দগুচ্ছে গেঁথে রেখে
সুখ সম্ভাবনার সোনালি দিগন্ত উন্মোচন করো নরম স্বভাবে, এ- ই স্বাভাবিক---

দেখা-অদেখায়

প্রদীপকুমার সামন্ত

দেখা আমাদের অদেখায়
তাতে কি আর আসে যায়
স্মৃতির বাঁধন বুকে
স্বপনের নক্সীকাঁথায়
নিভৃত মনেরই পাতায়
স্বপ্নে ভিজি কত সুখে ।

প্রেম, অপ্রেমে বেঁচে থাক
সরস গল্পেই শোভা পাক
রক্ত রাঙা কিংশুকে
সুখ-দুঃখ ছবি বুকে বাজে
বিরহ ব্যথা অন্তর লাজে
প্রেম শাশ্বত বলি হাসিমুখে ।

কি এমন ভালোবাসা কে জানে
ভাবুক মনোব্যথা কে আর মানে
শুকতারা হয়ে কাঁদি দুখে
আশাদীপ আজও জ্বলে যাই
আলেয়াতে সুখ খুঁজে পাই
তাতেই মন রাঙা টুকটুকে ।

কবিতা ও ছড়া

এ যেন রিকথগ্রাহী

সেখ মহাম্মদ ইউনুস

অভাব মোদের বাংলাদেশে
মাঝে মাঝে উপোস গেছে,
পালিয়ে এসে সুখের দেশে
হয়ে আছি বঙ্গদেশী,
তাড়িয়ে দেছে ওরা মোদের
মুখের বুলি রয় সে সদাই।

যারাই আসে চলে হেথা
বলে, তাড়িয়ে দেছে সব কেড়েছে
তাই এসেছি বঙ্গদেশে
বঙ্গ হবে আমার দেশ।

পদ্মা নদে অংশ ছিল
আঠারো বিঘা বাগান ছিল,
কেড়ে ওরা সব যে নিল
নিঃস্ব হয়ে এলাম তাই।

বাবা মা থাক না হোথা
ঘুর পথে পাঠাবো টাকা
ঘুচে যাবে দুঃখ ব্যাথা।
নাই যে কিছুই, ছিলই বা কী!
জলাভূমি, চুপ!
বলতে মানা ওসব কথা
হয়ে যাবে জানা জানি।

গো ভাগাড়ের গরুর ভুঁড়ি
চুপিসারে ঠাকুরঘরে
আঁধার রাতে এনে ফেলি
সকাল হলে দাঙ্গা লাগাই
মুছলমানের কীর্তি বলি।

সুখের এই দেশ করে দখল
সুখের স্বর্গে করব বাস
রাখবো না আর মুছলমানে
স্মৃতি চিহ্ন করব নাশ।

আর্য নামে দম্ভ যাদের
তারাই ছিল ভিনদেশী
আদিবাসী শূদ্র জাতি
এরাই এখন পরদেশী।

আদিবাসী শুদ্র জাতি
জাতি বর্ণের অত্যাচারে
জীবন রক্ষায় ধর্ম বদল
খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমানে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈশ্য ছাড়া
আর সকলেই শূদ্র তারা
তাদের কাছে স্বর্গ পাওয়া
তিন বর্ণের সেবা করা।

শূদ্রদের আপন করা
কঠিন হয়ে যে মানতে পারা
তার প্রতিবিধান করতে এবার
সংবিধানটাই পাল্টে ফেলা।

কবিতা ও ছড়া

হাওয়ায় ওড়ে চুল

সুব্রত চৌধুরী

হাওয়ায় ওড়ে খুকুমনির
সিল্কি কালো চুল,
প্রজাপতি উড়ে এসে
দেয় যে গুঁজে ফুল।

খুকু বেড়ায় পাড়া জুড়ে
মৌ মৌ ফুলের গন্ধে,
আলতা পায়ে নাচে খুকু
আপন মনের ছন্দে।

নাচতে গিয়ে হারায় খুকু
সোনার কানের দুল,
খুঁজে খুঁজে হয়রান খুকু
পায় না কোন কূল।

দাওয়ায় বসে ভ্যা ভ্যা কাঁদে
ছিঁড়ে মাথার চুল,
তারই শোকে গাছের পাতা
দোলে দোদুল দুল।।।

জোৎস্না তোমাকে

শেখ সিরাজ

তোমার আপেলের মতো রঙ
আমাকে আমোদিত করে
রুপোলী জোৎস্নায় আমার হৃদয়
আবেগে ভরে।
জেগে থাকে সাগর
অনন্তকাল ধরে
যেমন জেগে থাকি আমি
তোমাকে আপন করে।
জোৎস্না, মনের জানালা দিয়ে
তুমি এসো
তুমিও আপন করে
চিরকাল শুধু ভালোবেসো।

বন্ধু তুমি আমার

রবিয়াল চৌধুরী

বন্ধু, তুমি আমার ঘুম ভাঙানো সকাল
পলাশ রেনুর ছন্দ বাদল অনুভবের গান,
ভোর অ্যালার্মের গান বাঁধা এক সুর
রক্ত মেঘের হাসি, নীল নীলিমার প্রাণ।

বন্ধু, তুমি আমার কবিতা প্রেমের তুলি
লক্ষ হীরার ঊর্মি তুমি আমার আঙিনায়,
কৃষ্ণচূড়ার বনের রানী উদাস করা গান
দোলাও হিয়া শুভ্র কাশের নৃত্য ভঙ্গিমায়।

বন্ধু, তুমি আমার নিগড় প্রেমের শিকল
বর্ষা মনের বারিস ধারা শীতল শিহরণ,
বসন্ত সখার ভর দুপুরের সুরেলা গাঁথা
বাতাস ছোঁয়া আনমনা এক সে নাড়ির টান।

বন্ধু, তুমি আমার ভগ্নমনের বাঁচার স্বপ্ন
কাঙাল দেহের প্রীতি ক্ষুধার রসদ,
জোছনা আলোর মিছিল পথের পথিক
শরৎ ছোঁয়ার স্বপ্ন ভরা সোনালী রোদ।

বন্ধু, তুমি আমার মায়া ভরা পড়ন্ত বিকেল
সন্ধ্যা তারার সাথী গরম চায়ের কাপে,
তুমি হলে হঠাৎ বৃষ্টি সাদা বকের পাখে
রূপের বাহারে সুদৃশ্য নায়াগ্রাও ছাপে।

বন্ধু, তুমি আমার প্রণয় প্রীতির টনিক
স্বর্গ সুখের অনুরাগে আবেশ মাখামাখি,
প্রবাল দ্বীপের মুক্ত তুমি অগাধ জলরাশির
দিবারাত্রির মোহ তুমি শাশ্বত এক সাথী।

কবিতা ও ছড়া

ভ্যাবলা ফোড়ন

জলি ঘোষ

শ্রীমান ভ্যাবলা ফোড়ন দত্ত নামটা তো নয় মন্দ,
লিখতে বসে তারে নিয়ে লাগে মহা ধন্ধ।
দিব্যি ছিলেন খোশমেজাজে ছিলেন বড়ই শান্ত,
শুনলাম সেদিন মাথার ব্যামো বকছে শুধুই ভ্রান্ত।

আজকের যুগের তানসেন তিনি এমনটাই তার দাবি,
এ কী কয় রে! শুনে আমি খাচ্ছি শুধুই খাবি।
হঠাৎ যে তার কী যে হলো বুঝলাম নাতো কিছু,
সারাটা দিন গলা সাধে ছাড়ে না গান পিছু।

অফিসে গায় ছেড়ে গলা সা রে গা মা পা ধা,
চাইলে ফাইল ক্লার্ককে বলে 'বাপি বাড়ি যা '।
বৃষ্টিতে যায় প্রাতভ্রমণ বন্ধু শিবুর সাথে,
তাকায় দেখি ছাতা হাতে জামা নিয়ে মাথে।

গিয়ে দেখি অফিস সেদিন হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে,
'কেড়ে আমার চুল নিলো রে' বলছেন টাকটা চেপে।
'নেয়নি তো কেউ চুল যে কেড়ে পাচ্ছেন কেন ব্যথা?'
'আপনি ভ্যাবলা ছিলেন টাকলু এটাই সত্য কথা'।

ছুটির দিনে আলতু ফালতু ভ্যাবলা বকে খালি,
রেগেমেগে বউ তেড়ে যায় মুখ ভরে দেয় গালি।
'ঘুচবে ব্যামো দিলে ডিভোর্স এটাই আসল সত্যি',
ভ্যাবলা বলে 'ঠিক ধরেছো মিথ্যা নয় এক রত্তি'

একান্ত স্বজন

জ্যোস্না হালদার

সেই কবেকার ফেলে আসা দিনে
তোকে আমি পেয়েছিলাম আমার সাথী রূপে।
তুই ছিলি আমার সবরকম ভালো লাগা
মন্দ লাগা আর দুষ্টুমিতে।
শৈশব পেরোনো কিশোরী মন
তোকে ভালোবেসে ছিল।
প্রজাপতির ডানায় ভর করে
শরীর জুড়ে যেদিন নামলো যৌবন
প্রথম সেদিন তোর ছোঁয়াতে
লাগলো ভীষণ ভালো,
মনের মধ্যে জ্বলে উঠলো যেনো
হাজার বাতির আলো!
হঠাৎ তুই কানের কাছে নাক সিঁটকে
শুনিয়ে গেলি 'তুই খুব কালো'!
এক ঝটকায় নিলাম নিজেকে গুটিয়ে।
ভালোবাসার বর্ণলিপি গেল মুছে
বন্ধুত্বের বন্ধন গেল ঘুচে।
হৃদয় ভেঙেছে,হয়েছি নিশ্চুপ
তোর জন্য মনের মধ্যে ভরেছে ঘৃণার স্তুপ।
সমাজে আমি দলিত, তোর কাছে কালো
কিন্তু সেই আমি হাজার বাচ্চা কে
আজ দিচ্ছি শিক্ষার আলো।
জাতপাত রূপ রঙ শুধু বাহ্যিক আবরন
হৃদয় মাঝারে ডুব দিলে বন্ধু
তবেই মেলে একান্ত স্বজন।।

কবিতা ও ছড়া

বাঁচো
অ্যামেলিয়া দাস

নির্বাকেরা মরছে যত
ভয়াবহ মহামারীর মত,
ক্ষত যত এ সমাজে
মিটবে কি আর বেদ-নামাজে;
ক্ষোভের যত বহিঃপ্রকাশ
লাগিয়ে শুধু গলায় ফাঁস,
নিভলো ভগ্ন হৃদয় আলো
মরলে তুমি, কার কী হলো
মৃত্যুতেই বিধির বিধান
কাড়লে প্রাণ, পেলে সমাধান?
দেশের কথা কি আর ভাবলে তুমি!
জয়ের পথে মানছে হার সত্যভূমি;
প্রতিবাদী হয়ে জাগতে হবে
সবে মিলে সবে,
মিথ্যেকে আর নয় প্রশ্রয়
দূর করো সব সমাজ ক্ষয়;
জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানেই বিপ্লব
বাঁচো, মুখরিত হোক জয়ের রব।।

ভাঙাচোরা গল্প
হাসি বসু

বন্ধ দরজা খুলে দিলে আকাশকালো মেঘ নিয়ে
কাঁঠালিচাঁপার টুপটাপ সুগন্ধি ফোঁটারা
চাঁদভেজা গল্প বলে, চলে যায়
ও পাড়ার রান্না ঘরের দাওয়ায়
মোটা ভাতের সোঁদা গন্ধ মেখে
এক থালা আশ্বাস দিয়ে যায়
সঙ্গে থাকে আগুন নেভানো শ্রাবণ ধারা
আর শ্যাওলা ধরা ভাঙাচোরা উঠোনের গল্প।

আমার দুর্গা আজ অসহায়
বটু কৃষ্ণ হালদার

তোমার দুর্গা, বিশ্রাম নেয়,সোনা বাঁধানো খাটে
আমার দুর্গা ফিরছে বাড়ি,রক্ত পায়ে হেঁটে।
তোমার দুর্গা পাত পেড়ে খায়, সরু চালের ভাত
আমার দুর্গা ক্লান্ত হয়ে,রাস্তায় কুপোকাত।
তোমার দুর্গা বায়না ধরে, হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন
আমার দুর্গা ঘরে ফিরে,কোয়ারেন্টাইন হোম।
তোমার দুর্গার নতুন জামায়,সেজেছে পরিপাটি
আমার দুর্গা ভিক্ষা করে,হাতে ভাঙ্গা বাটি।
তোমার দুর্গা এসিতে থাকে, স্বপ্নে পূর্ণিমার চাঁদ
আমার দুর্গার বাড়ির পাশে,ভেঙেছে নদীর বাঁধ।
তোমার দুর্গার চলার পথে,পিছু নেয় সারা পাড়া
আমার দুর্গা বিনা দোষ, সংসারের লক্ষ্মীছাড়া।
তোমার দুর্গার ছাতনা তলায় বাজে সানাই বাঁশি
আমার দুর্গা পণ প্রথায়, দুই বেলা হয় ফাঁসি।
তোমার দুর্গার সুখ স্বপনে, বছর ভর পৌষ মাস
আমার দুর্গার আশ্বিনেতে, নিদারুণ সর্বনাশ।
তোমার দুর্গা না চাইতে ই, রয়েছে দুধে-ভাতে
আমার দুর্গা জীবনযুদ্ধে,মরছে অপঘাতে।
তোমার দুর্গা প্লেনে চড়ে,মাটিতে পড়ে না পা
আমার দুর্গা রাস্তাঘাটে,হারিয়েছে তার মা।

শামুকের অনাগত শোক
সাহানুর হক

ইউনিভার্সিটির পথে দেখা হয় অনেকের
দেখা হয় সিনিয়র,জুনিয়র সকলের
এমনকি স্যার,ম্যাম থেকে ভার্সিটির নন,টিচিং স্টাফ
সকলের সাথেই আমার চেনা পরিচয় এই পথে
তোমার সঙ্গেও তো যথাযথ ভাবেই চোখে চোখ রেখেছিলাম
যাদের কথা বলা হল তারা সকলেই
আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, রাস্তা পারাপার করেছে
তথাপিও তুমি আমার সাথে পরিচয়ের পর
এই বুকের ভিতর দিয়ে কিভাবে হেঁটে গেলে?
ইউনিভার্সিটির পথে অনেকের সাথেই তো পরিচয় হয়েছে,
অথচ তোমার সাথে পরিচয় যেন শামুকের অনাগত শোক!

কবিতা ও ছড়া

সেথায় যেতে চাই

প্রহ্লাদ কুমার প্রভাস

স্বপ্ন আমার দু-চোখ জুড়ে,
যাব আমি অনেক দূরে।
যেথায় শুধুই শান্তির বাতাস বহে অণুক্ষণ,
কোকিল ডাকে কুহু সুরে।।

যেথায় কারো মনে নেই জেদ,
নেই কোন ধর্মের ভেদাভেদ
মন যে আমার সেথায় যেতে চায়।
যেথায় কারো মনে নেই হেলা,
করে মুক্ত মনে খেলা
বলো, এমন দেশ কোথা পাই ?

যেথায় নদীর কুলকুল ধ্বনি,
কর্ণ জুড়াবে শব্দ শুনি
জুড়াবে জীবন,নদীর শীতল ধারায়।
যেথায় আমার মুক্ত মন,
পাখিরা উড়ে বেড়ায় যেমন,
 তেমন বেড়াতে চায়,
বলো,এমন দেশ কোথা পাই ?

যেথায় আছে শান্তি,
নেই নগরজীবনের ক্লান্তি
যেতে চাই সেই দেশে
বলো,বলো,কোথা পাই ?
নেই যেথা রাজনৈতিক অস্থিরতা,
আছে শুধুই নীরবতা
এমন দেশে মন হারাতে চায়।।

নাই যেথা দরিদ্র পীড়ন,
অন্যের ঘরে অহেতুক লুণ্ঠন যেথায়,
হিন্দু, মুসলিম এক হয়ে অবাধে করে বিচরণ।
যেথায় কেউ ক্ষমতার বশে,
গরীবকে পিটায় না,নানা অজুহাতে
সেথায় যেতে চায় এই মন।।

ছবি

জুমেলী সরকার

সেই যে তোমার কথা রাখার কথা
সেই যে তোমার হাতে আমার হাত
সেই যে তোমার চোখ চোয়ানো ব্যথা
সেই যে আমার ঘুমে আড়ির রাত...

ওই যারা সেই ইটের পরেই ইট
গেঁথে গেল তোমার আমার মাঝে
ওই যারা সেই ঝড়ের পরেই ঝড়
তুলে খুব আঁধার ছেঁটায় নামে...
তারা আজ কোথায়? নিরুদ্দেশে?
তারা আজ তারার দেশেই জোটে
মাঝে শুধু শূন্য বছর কুড়ি
নতমুখে বিষাদ হাওয়ায় লোটে

সে তো এক অন্য যুগের কথা
সে তো আজ ঝাপসা কুহক কাচ
আজ এই বর্ষা মুখর রাতে
মন খাঁজে স্মৃতির শহর আজ

ভালো আছো অন্য যুগের সখা
আজও বাঁশি সুরের মহল গড়ে
আজও চোখে স্বপ্নে মাখায় রোদ
আজও ঠোঁটে আগুন ফুলকে ঝরে

আজ আমি নীরব কথামালা
গাঁথি বসে বন্দি খাঁচার পাখি
মরু তৃষা বুকের ভেতর পুষে
ছবি তোমার যত্নে আগলে রাখি।

ভাবনা

শম্পা ঘোষ

বৃত্তের ভেতর আরেক বৃত্ত
চারপাশে মহাকাশের শূন্যতা,
এতই কি সোজা যোগ পরিমিতির সূত্র বোঝা!
চিত্রার্পিত আকার নেহাতই এক কল্পনা.
ভালোবাসার কালশিতে দাগ আজও জীবিত
প্রবাহমান রক্তধারার জীবাশ্ম হয়ে
একটু একটু করে সরতে থাকো তুমি,
অস্তিত্ব অনস্তিত্ব এর মাঝে খুঁজে পংকির বর্ণমালা।

কবিতা ও ছড়া

বসন্ত

মন্দিরা মুখার্জ্জী ব্যানার্জ্জী

পরিযায়ী শীতের পর্দা সরিয়ে
শহরে নামছে সন্ধ্যার বসন্ত ।
এই বসন্ত একটা গল্পের মতো ,
রুক্ষতা মুছিয়ে ক্লান্ত প্রকৃতিতে
প্রাণ ফোটায় সে ।
কুয়াশা সরিয়ে রোদের কুচি
ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে ।
পাখিরা ডানা মেলে উড়ে যায়
নিজেদের দেশে ।
ঘর ফেরত আনন্দ তাদের চোখে
ঘাসের উপর চকচকে শিশির
চিঠি লিখেছে ,
বছর খানেক পর আবার আসবে ।
শীতের উপকরণ, আদরের ওম
সবাই বরণ করে নেয় বসন্তকে ।
পাতায় পাতায় লেখা হতে থাকে
নতুন ঋতুর গল্প ।
শীতের শেষ ও গ্রীষ্মের শুরু,
সে এক আশ্চর্য অনুঘটকের
নাম বসন্ত ।

সিগনেচার

অন্তরা সরকার

কুন্ডলিত রাতটা ক্ষিপ্রগতিতে নেমে আসে দুরন্ত উদ্দীপনায় ,
জটিল আবর্তে পায়ে পায়ে নিঃশব্দে মরণ।
ধ্বস্ত দিনলিপিতে মুখ ঢেকেছে সূর্য।
দিশেহারা দিশাহীন পথচলা।
ধর্ষিত মনটাকে ফালাফালা করে চিরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলে?
তবু বাঁচতে চেয়েছিলাম জান!
যেমন করে সূর্যমুখী আলো আঁকড়ে পৃথিবীর বুকে।
অথচ ,
আগুনের গনগনে আঁচে দগ্ধ শরীর।
চলে যেতে চাই দিগন্তরেখা পেরিয়ে
নক্ষত্রমালার দেশে।
চলে যাব।
শুধু তোমার কঠিন হৃদয়ে ফলাব ধান রঙা ফসল।
অথবা -
রঙিন কালিতে আমার গভীর ভালবাসার দস্তখত।

বিদায় রসিদ ভাই

(সুরসম্রাট রসিদ খানের প্রয়াণে)

বিশ্বজিৎ সিনহা

তুমি,
উত্তর থেকে এলে সংগীতের পাঠ নিলে
বাংলাকে ভালোবেসে এখানেই থেকে গেলে
বদায়ুন ভূমিপুত্র সংগীতের শীর্ষ গোত্র
উদ্ভাসিত দুই নেত্রে
সুরের সাগর।
গড়ো,
শিল্প সুষমা ভরা অমৃত কলসে
মানবতার জয়গানে চৈতন্য জাগর।
সুরেলা সফর সেরে তুমি গেলে অস্তাচলে
সময় না হতে তবু না বলেই গেলে চলে।
নন্দনের উপবনে হৃদয়ের উদ্বোধনে
মানুষকে ভালোবেসে হলে তুমি ধন্য
বঙ্গমাতার কোলে চির শান্তি পেলে ভাই
সহস্র প্রণাম নিও সাধক অনন্য।
গুলির শব্দ নয় নীরবতা বাঞ্ছনীয়
নয় তীব্র কলরব অনুভূতি বরণীয়।
কে বলে গো তুমি নেই বেশ আছো অপরূপ
সৃজিত স্পন্দনে
সুর-সম্রাট মগ্ন হৃদয়েতে লগ্ন
সুরমাতা বন্দনে।

এই শরতে

কাশীনাথ মোদক

শরৎ খুশি রঙিন সাজে
নীল আকাশে নরম তুলো
হাত বাড়িয়ে ছোট্ট খোকা
আজকে দেখি ওকেই ছুঁলো।

শিউলি মালা কাশের বেনী
পদ্ম সাজায় পুকুর ঝিল
বলছে ছড়া আমায় দ্যাখ
আছে আমার অন্তমিল।

যেই চেয়েছি সমুখ পানে
ঘাস মাথায় শিশির কণা
বলছে হেসে এই শরতে
খুব মিষ্টি সূর্য সোনা।।

কবিতা ও ছড়া

জীবিত সময়

সুভাষিতা ঘোষ (দাস)

দেখতে দেখতে আমার উন্মত্ত সময়
ক্লান্ত হয়ে গেল !
যে জাহাজটা ভুলবশত
অকারণে ছুঁয়েছিল বেনামী বন্দর
শতাব্দীর আয়ুষ্কাল শূন্য হতেই
অজস্র অবাক কৌতূহলও মৃতপ্রায় !
এখন শুধু এক নিরস হাসির কাজকারবার
প্রথম মিথ্যের পর সুনিশ্চিত মৃত্যুর অধিকার !

দেখতে দেখতে আমার উদ্ভ্রান্ত সময়
এই যাযাবর বাতাসে বিলীন,
একলা নির্বাসনের দণ্ড স্বীকার করে
ক্ষুধার্ত নাবিকের মতো চিবিয়ে খায়
অস্তমিত প্রতিশ্রুতির পাণ্ডুলিপি !

দেখতে দেখতে আমার জীবিত সময়
পৃথিবীর আয়নায় দেখে বলিরেখার দাগ,
কলতলায় জমে থাকা স্নেহের অভাব !
পিছলে পড়ে যাওয়ার কথা মনে হতেই
তরুণ ঘোরসওয়ারের মতো
তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে তার প্রতিবাদ।

আমার জীবিত সময় তবু আজও
এক পল অবকাশে শুষে নেয়
বিগত মিটারে চড়া পারদের উত্তাপ !

বীভৎস বালির জিহ্বা

শংকর নাইয়া

প্রাচীন তৃষ্ণা
পেরিয়ে গেল লক্ষ যাপনকাল
তবুও মধ্যস্থতায় ফেরেনি কোনো কৃতার্থ মেঘ

মরুপথে পড়ে আছে যে বিদিশা আর গ্লানি
তাতে সংযম অনুরণিত হলে
অঙ্গীকার খুঁজে চলে শাশ্বতের জলাশয়

জলাশয় কাছে এলে
পড়ে থাকে কিছু নির্জীব লবণ আর আঁশ
পড়ে থাকে রক্তাক্ত শুকনো পালক

নির্ভীক মরুঝড়ে
সেই পালক আর আঁশ উড়ে গেলে
সরে যায় মরুবুকের লবণস্তর
আর অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে বীভৎস বালির জিহ্বা

অপেক্ষার আলো

পলাশ পাল

হঠাৎ থমকে যাই আত্মবিশ্বাসের পথে...
আরো একবার
জীবন প্রদীপগুলো জ্বলে ওঠে
আরেকটু কাছে গেলেই
ওদের শরীরের ভালোবাসার সুবাস
আমিত্বকে স্পর্শ করে
আমি একমুঠো সুবাস
তোমায় উপহার দিই
তবুও দ্যাখো কাঁদতে কাঁদতে প্রতিফলিত হয়
অপেক্ষার আলো
কথা ওঠে,
আমি বদলাতে চাই, আমি বদলাতে চাই
প্রদীপের জ্বলন্ত পোড়া তেলেই যখন
নতুনের জন্ম দেখি...

কবিতা ও ছড়া

ঝড়ের দাপট

দীপঙ্কর বৈদ্য

ঝড়ের দাপট আসছে তেড়ে
দিক হারিয়ে আঙুল তুলে,
দরজা-জানলা বন্ধ দেখে
কাঁপিয়ে যায় মনের ভুলে।
চন্দ্র-সূর্য আগেই ভাগে
দুখী মেয়ে কেঁদে চলে,
তা থৈ তা থৈ নূপুর ধ্বনি
দাপট থামো সবাই বলে।
গাছপালা আর ঘরবাড়ি সব
কাঁদে যেন মড় মড় মড়াৎ,
সারাবেলা চারিদিকে
দুর্যোগের এই চিন্তা সড়াত্।
স্তরে স্তরে জীবন জুড়ে
ঝড়ের লীলা আনাগোনা,
মরণ খেলায় টলে সবাই
খোঁজে বাঁচার নোঙরখানা।

এখনও তোমারই

মানালি

কার চাহিদায় আসমান খুঁজে ফেরা ?
কিসের জন্য এত পথ ঘোরা ?
কার হাতে ওই জীবনপ্রদীপ দিয়েছো ?

কার স্বপ্নকে সত্যি করতে
দিনরাত তুমি কাঁচের উপর হেঁটেছো ?

কসম দিয়েছে, আঘাত দিয়েছে,
সেই কি আবার ব্যথার মলম হয়েছে ?

বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে,
প্রেমের পরশ আদরে মেখেছে,
তাকে কি তোমার এখনও মনেতে রয়েছে ?

ফিরে যেও তবে, কাছে টেনে নিও,
যদি দেখো সে এখনও তোমারই রয়েছে।

জ্যোৎস্না মাখা কবি

সুবিমল সোম

তখন আমি জ্যোৎস্না মেখে
গোলাপের পাপড়ির আলস্যে
কবিতার কোলে ঘুমিয়ে ছিলুম,
ফুল পরীরা কবিতার পাপড়ি
বুলিয়ে দিচ্ছিল চোখে।
দীর্ঘ লোডশেডিং এর কালো ছায়ায়
হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি
আমার নিজস্ব দেশ নেই
আমার নিজস্ব সংস্কৃতি নেই
প্রিয় বর্ণমালাকে ওরা বেঁধেছে শিকলে ।
এত গাঢ় ঘুম ছিল
কোন কান্না কোন আর্তনাদ
ডিঙোতে পারেনি কবিতার খাতা।

যখন প্রিয়তমাকেও গভীর রাতে
সাজতে হয়েছিল রঙিন শাড়িতে
তখনো আমার প্রশ্নহীন ঠোঁটে
চাঁদ থেকে ঝরে পড়েছিল কবিতার বসন্ত।

গ্রীষ্মের দুপুর

সৌমেন কর্মকার

বেলা বাড়তে উচ্ছসিত,সাজে খরতপ্ত রোদ্দুর,
চারিদিকে শুরু দাবদাহে, নিমগ্ন গ্রীষ্মের দুপুর।
শূন্য পুকুর-খাল-বিল,চাতক পাখিরা ঐ ডাকে,
মিষ্টি মিষ্টি আম-লিচু উঁকি দেয় ডালের ফাঁকে।

প্রকৃতি নিথর হয়,জ্বলন্ত সূর্য হাসে মধ্য-গগনে,
অসহ্য তেজে,উষ্ণ হাওয়া দেয় তা ক্ষণে-ক্ষণে।
শ্রান্ত হয়ে অবলা প্রাণীরা খোঁজে ফেরে আশ্রয়,
ঝরে পড়ে শুকনো পাতা, রুক্ষ মাটি ধুলোময়।

যানবাহন চলাচল,ব্যাকুলেতে চায় দোকানপাট,
নিঝুম পাড়া,অলিগলি ডুবে যাওয়ার অবসাদ।
শুষ্ক মুখে পিপাসা ওঠে, সর্বাঙ্গ জুড়ে ঝরে ঘাম,
প্রহর স্রোতে অসহনীয়, বাদ যায় না শহর-গ্রাম।

স্নিগ্ধ আরাম লাগে সেথা গাছের ছায়ার তলে,
ক্লান্ত হয়ে অজস্র পথিক একটু জিরিয়ে চলে।
খাঁ খাঁ মাঠ-ঘাট নির্জন সব নেইকো কেউ পথে,
ছোট-বড়ো বাড়িতে মানুষ থাকে নিদ্রার জটে।

কবিতা ও ছড়া

শেষ আশ্রয়

অভিজিৎ রানা

মনের গভীরে যেখানে তোমার ঠাঁই,
যেখানে সাধনে তোমাকে খুঁজে যাই,
সেখানে তোমার পেতেছি আসনখানি;
পুষ্পে-পত্রে-দীপ-ধূপ-মালাআনি।

এ- সবই আমার মনের-ই অঞ্জলী,
তোমাকে খুঁজেছি শত পথে চঞ্চলী,
সহজে ধরা দাওনা সে আমি বুঝি;
কত সুর বাঁধি পথে প্রান্তরে খুঁজি!

তুমি কর ছল, কত কৌশল
না জানি তোমার জানা;
চরাচর-ময় অবাধ চরণে
তোমার নেই কী নিষেধ মানা !

তবে কেন বাঁধো অলোক মায়াই,
ডাকো না কেন চরণ ছায়ায়,
রাখো কেন দূরে কেন কর পর?
খোল প্রভু তোমার বন্ধ সে ঘর!

প্রজ্ঞা আমার স্বল্প মূঢ় স্বভাব,
তবে কী চেতন সহজে হবে না লাভ!
প্রভু! সরল পরে তোমায় খুঁজে খুঁজে,
তোমার সাথে সহজে করিব ভাব।

তুমি বড় মায়া, তারই আলোছায়া,
শত পথ কর যে আলেয়া!
খেল লুকোচুরি কোন সে ধাঁধাঁয়,
ছলকলা কর হেলায় চলিয়া!

তবু জানি কভু ফিরি সে পথে,
লভিবো তোমায় সজ্জিত রথে,
আশীষ করে চরণে দিও আশ্রয়;
চরাচরভবে সকলিতো তোমায়।

প্রেমের উপাখ্যান

তরুন কুন্ডু

অনন্ত ভাবনার উন্মেষে এক নতুন প্রেমের উপাখ্যান
আবিষ্কার করেছিলাম আমি আর চারুলতা
সেই বহু বছর আগে,হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এক অপরূপ কথা
তখন ঘন্টার পর ঘন্টা কলেজ পাড়ায়
তেঁতুল গাছের শিকড়ে পিঠে পিঠ দিয়ে বসে
পরিপূর্ণ যৌবনের সুখ, দুঃখ, যন্ত্রনা ভুলে
জমাট বাঁধা বিষন্নতায় পাগলের মতো প্রেম করতাম
হেমন্তের সন্ধ্যায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ার আবহে
বলে উঠতাম তুমি আমার প্রথম প্রেম চারু লতা

এখন আমার - মন খারাপের দিন ফুরোতে চায় না
চোখের পাতায় জ্বল জ্বল করে ব্যথিত ব্যাকুল ইতিহাস
হাত পা নড়বড়ে, নেই কোন চাল চুলো, মেপে হাঁটার গুন
দীর্ঘশ্বাস বুকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠি
লজ্জাবতী গাছের মতো প্রেম বিষাদে কুঁকড়ে যাই
সুতো কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো ছুটে বেড়াই
প্রাচীন শিলালিপি থেকে নিখাদ প্রেমের সুখ দুঃখের গান
নিবিড় কুয়াশায় মিলিয়ে যায় পারস্পরের অন্তহীন বেদনা
আগাছায় ভরে থাকে সামন্তরাল প্রেমের উপাখ্যান।

শরৎ এল রে

রমা মুখার্জী

নীল আকাশে ভাসছে মেঘ
মনে হচ্ছে পেঁজা তুলো।
মেঠো হাওয়ায় মাতাল হল
কাশের ঝাড়গুলো।
শিউলি ফোটার গন্ধে বাতাস
মো মো করে।
উৎসবে মুখরিত প্রকৃতি
আজ মন বসে কি ঘরে?
মা আসবেন কদিন পরে
আমাদের সবার দুর্গা মা।
দুর্গতি নাশ করেন তিনি
তার যে অপার মহিমা।
অসুর বধ করে জগতের
তিনি হলেন রক্ষাকারিনী
সিংহ তার বাহন তাই
তিনি হলেন সিংহ বাহিনী
কেনাকাটা করবো শুরু
চলরে ,সবাই মিলে চল।
মা আসছেন বাপের ঘরে
সবাই জয় মা দুর্গা বল।

কবিতা ও ছড়া

চিত্র নাট্যের শিল্পী মাত্র

অখিল চন্দ্র পাল

হাজার কাজের ভিড়ে আমি
খুঁজি মাধুর্য্যতা,
খুঁজি, সামাজিকতার সুরেলা
পরিবেশে - একটুকরো সবুজপৃথিবী।
খুঁজি দুঃসহ ভাবনায় মনুষ্যত্ব বোধ
ও জ্ঞানেরএকটি সুন্দর আয়না।
যেখানে থাকবে প্রেমগাঁথা জীবন,
একটুকু সুবাস।

মান- অভিমান,দ্বেষ- বিদ্বেষ
এতো ভালোবাসার আত্মবোধের পরম সখা।
সে অলীক বাস্তব।
হাস্নুহেনার মতো দীপ্ত মান- রজনীগন্ধা
হাজার কাজের ভিড়ে আমি
যেনো এক চিত্রনাট্যের শিল্পী মাত্র।

অধরা নক্ষত্র

ড. শমিতা ভট্টাচার্য

এভাবে চেয়ে থেকো না
তোমার চোখে নক্ষত্রের আলো
ফিরিয়ে নাও দৃষ্টি...
আমি আবার হারিয়ে যাব...
কালো গহীন অন্ধকারে।
তুমিও নিজেকে খুঁজে নিও
পরিযায়ী পাখিরা দৃষ্টির আলোকে
হাসি কান্নার গল্প শুনাবে
তুমি তাঁদের হয়ে ভালো থেকো।
এভাবে চেয়ো থেকো না...
তুমি নক্ষত্র হলেও সূর্য নও
তাই দূরের থেকে কাছের আলো
ছিনিয়ে নিও না।
ভালোবাসার প্রহসনের অন্ধকারে
ডুবে যেতে যেতে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখ
তুমি কোটি তারা পরিবৃত অক্ষয় নক্ষত্র।
যুগ যুগ থেকে আকর্ষিত করো
কিন্তু অধরা থেকে যাও বিরহী বাঁশির তানে।

জীবনস্রোতের টানে

সমীর কুমার দত্ত

জীবিকার খোঁজে জীবনস্রোতে হারিয়ে গেছি অচিনদেশে
পাইনি খুঁজে পরিচয়
তাইতো আমি হাতড়ে বেড়াই, কোথায় গেলে পাবো যে ঠাঁই
তরুচ্ছায়ার 'শান্তনীড়ের' সেই আঙিনায়।
একাকীত্বের আয়না দেখি, দুঃখ লাগে খুব
কইবো কথা,পাবো কোথা, আছে কি সেই মুখ,
শৈশবের সেই কাছের মানুষ, কেন তারা নিশ্চুপ,
একটা সময় সোহাগ দিয়ে ঘিরেছিলো, পেতাম কত সুখ,
হয়তো তারা নেই, নয়তো তারা ভুলে গেছে, আমি তাদের কেউ।
আমি তো আর ছোট্টটি নেই, মস্তবড়ো মানুষ,
মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে শিশুর মতো উড়াই বটে কল্পনারই ফানুস।
জীবন নয়তো ছবি, বাঁধিয়ে রাখার মতো
জীবন হলো নদী, আপন বেগে বয়ে চলে, বাধা না পায় যদি,
জীবন নদীর গতিহীনতা চরম দুঃখে
নদী তো আর যায় না ফিরে তার উৎস মুখে।
যখন আমি যেথায় থাকি জীবনস্রোতের টানে,
'নস্ট্যালজিক' আমি সেখান থেকে দেখতে থাকি
বর্ষশেষের নিশার অবসানে, নববর্ষ কি বার্তা বয়ে আনে,
শারদপ্রাতে দুর্গাপুজোর ঢাকের আওয়াজ আসছে ভেসে কানে,
ভাসছে চোখে আসছে লোকে দলেদলে দেখতে ঠাকুর দালানে,
শেফালিকার গন্ধে তখন এ মন কি আর রয় এখানে।
দেখতে থাকি 'শান্তনীড়ে'র ছোট্ট গাঁয়ের চারণভূমে
তন্দ্রাবিষ্ট রাখাল ছেলে বসে আছে বৃক্ষশাখে,
গরু-বাছুর এদিক ওদিক চরে ঘাস খাচ্ছে মাঠে,
পূর্বাহ্নে ঝিউড়ী মেয়ে কাচ্ছে কাপড় পুকুর ঘাটে,
অপরাহ্নে চাষীর মেয়ে ফিরছে ঘরে খড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে।
এমন সময় দিন গড়িয়ে আকাশ এলো কালো করে,
দেখতে থাকি 'শান্তনীড়ে' কেমন করে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে,
ঘরে ফেরা পাখিরা সব ঝগড়া করে ধানের গোলার খড়ো চালে,
গৃহবধূ আঁচল গলে তুলসী তলে প্রদীপ জ্বালে,
ছেলেপুলে পড়তে বসে হারিকেনের আলো জ্বেলে,
মাষ্টারমশাই লিখতে বলে ছড়িহাতে ঢুলছে বসে,
দেখতে থাকি আঁধার কেটে কেমন করে সূর্য ওঠে
পূব আকাশে পাতার ফাঁকে,
আবছা আলোয় বাগগ্দী মেয়ে পুকুর পাড়ের হাঁটুজলে গুগলি তোলে,
কেউ বা আবার দৌড়মারে তাল বাগানে ভাদ্রমাসের তাল কুড়োতে,
ভোর না হতেই মোরগগুলো সমস্বরে উঠেছে ডেকে উচ্চনাদে,
তিষ্ঠানো দায় খড়োচালের নীচে বসা পায়রাগুলোর অবিশ্রান্ত বক্গ্বককমে,
গোটাকতক কাঠবিড়ালি সারাবাড়ি ছুটে বেড়ায় খাবার খোঁজে,
চাষীর ছেলে বলদ নিয়ে লাঙল কাঁধে যাচ্ছে ক্ষেতে,
কাজের মেয়ে বেরিয়ে পড়ে গোবর দিয়ে ঘর নিকোতে ।
এ সব কিছু ঘটতে থাকে যখন থাকি ঘুমের দেশে
গাঁয়ের ছবি আঁকতে বসি ভরনিশিথে ঘুম না এলে ।।

কবিতা ও ছড়া

আমার দেখা

গৌ উ র দে

তীব্র দাবদাহেও দেখেছি আমি
অকাল বর্ষনের নিঃশ্চুপ হাহাকার,
শুভ্র জ্যোৎস্নালোকিত স্নিগ্ধতার আড়ালেও
দেখেছি, গাঢ় তামসার নিঃসঙ্গ অধিকার।

দখিনা হাওয়ার স্রোতে হিমেল বাতাসে
মৃদুমন্দে ভেসে যায় নানা ফুলের সুগন্ধ,
উত্তরের দমকা হাওয়াতেও পেয়েছি আমি
শ্মশানে দগ্ধিত হাজারো শবদেহের জঘন্য দুর্গন্ধ।

প্রকৃতির রোষে অল্প বরিষনে
সকলি যার পুড়ে হয়েছে যে ছারখার,
দিব্যলোকের দ্বারে সকাত সলিলে
মুছে গেছে সকল অবদান নিঃশব্দে আজ তার।

নীলাকাশে ভেসে গেছে;
বিষাক্তময় রক্তাভ আগুনের ফুলকি ভরে,
নিরাসার নোনাজলে নিমজ্জিত
হয়েছে সব আজ হয়তো সে বেদনার বালুচরে।।

কাক

ইরফান মল্লিক

একটি কাক
দিচ্ছে ডাক
গাছে ফল দেখেছে
কাকের দল বেড়েছে
বললো কাক উড়ে যাই
নীল আকাশে বিদায় জানায়
উড়তে উড়তে দিচ্ছে ডাক
শিয়াল এল বাপরে বাপ !

জীবন যাযাবর

শম্পা কর্মকার

আমি সেই একাই দাঁড়িয়ে আছি
পাহাড় নদী পার করে ক্লান্ত যাযাবরের মতন।
যার ঘর বাঁধার স্বপ্ন, স্বপ্নে বেঁধেছিল ঘর
যা ভেঙেছিল প্রতিদিন ঘুম ভাঙার সকালে।
জীবন চলার নেশায় হেঁটেছি পা না গুনে
তাই দূরত্বটা দূরত্বই থেকে গেছে!
ঝরে পড়ার খেলায় আনন্দ বিলি করি
ওই টুকু সম্বল তার খুঁজে দেয় মানে।
কিবা আসে যায় সে আজ হাসে আমার ডাকে
কাল সে দুলে যায় অন্য দোলায়।
মিছে অভিমানে নিজেকে ভাঙি
জানি যেতে হবে ক্লান্ত আমি।
ঔ যে হেঁটে যাওয়া মানুষের মাঝে
যদি পারে ছুতে মন তারে ক্লান্ত এ শরীর।
সার্থকতার জল ছাপা রঙে ভেজে মন
ফিরে পায় তার ঘর ভাঙার মানে।
যাযাবর আমি ফিরি তার ডাকে ঘরে
যে করেছে আপন না দেখে আমারে।

অ-এ অজগর

দিলীপ কুমার মধু

বান্টি পড়ে হেলে দুলে 'অ-এ অজগর' আসছে তেড়ে
যে যেখানে আছিস রে ভাই শিগগির পালা জঙ্গল ছেড়ে।
নইলে গাছের পাতায় চড়ে লাফ দে অজগরের মাথায়
তার আগে ঠিক নিস যেন তুই আপাদমস্তক মুড়ে কাঁথায়।
তা যদি না করতে পারিস অজগরের পেটে ঢুকে
নরম জায়গা খুঁজে নিয়ে লাফ দড়িটা খেলিস বুকে।
এতেও যদি আপত্তি হয় মাটি খুঁড়ে ফাঁদ পেতে রাখ
পশুপাখি খুঁজে এনে আশেপাশে রাখিস একঝাঁক।
দেখবি তখন অজগরটি তোকে বলবে প্রণাম ঠুকে
ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে, আয় চলে আয় আমার বুকে।

কবিতা ও ছড়া

মেহনতি কন্ঠস্বর

সৌরভ আষ

শুভেচ্ছা,প্রীতি,অভিনন্দনের ছড়াছড়ি।
সেলিব্রেশন কচি পাঁঠার ঝোলে...
শ্রেণীসংগ্রামের মেহনতি কন্ঠস্বর আজ অস্তমিত।

আর্টিকেল আজ সকল সংবাদপত্রে...
গালভরা,সারগর্ভ বক্তব্যে
ওদের পেট ভরে কী?
ওরা কাজ করে....

আটের বদলে দশ/বারো ঘন্টা
এটায় নিয়ম...
কর্পোরেট দুনিয়ায়।
সব নিশ্চুপ....ক্ষুধা'য় ।

প্রতিবাদও ভার্চুয়াল...
কম্প্রোমাইজ -এর জটাজালে..
মালিক, সর্বহারা..খগনতন্ত্র
সব তালগোল পাকিয়ে যায়....!

যাপিত জীবন এগিয়ে চলে
দিশাহীন নিশানায়
ইতিহাসের পাতায় থেকে যায় স্লোগান...
ইনকিলাব , শোষিত , লাঞ্ছিত শব্দগুলো।

ঝড় বৃষ্টিতে নাকাল

সুলেখা চৌধুরী (মল্লিকা)

ঝড় বৃষ্টিতে কিছু মানুষ করে আনন্দ মজা
কিছু মানুষের চোখ অশ্রুতে ভেজা।

বৃষ্টি মানেই গুনগুন গুণ গান ।
কারো জীবনে আসে বান ।।

প্রবল বৃষ্টি ঝরে পশুপাখিদের চলে বাঁচার লড়াই।
দুর্গত মানুষরা জীবনে পেরোয় চরাই উৎরাই।।

কত গাছ পড়ে ধুপধাপ
বিজলীবাতির তার যায় ছিঁড়ে ।
ঘন কালো মেঘে আঁধারে
বসে থাকি চুপচাপ নীড়ে।।

চোখে আসে না ঘুম ,দিন রাত নিঝঝুম।
ঝড়ে কান পাতা দায়।
মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে বিজলীও চমকায় ।।

নদী সমুদ্রতটের মানুষ করে হাহাকার।
শহর গ্রামে এখন হাঁটু ডোবা জলে মানুষ জেরবার।।

আবর্জনার স্তুপে ভরাট হচ্ছে পুকুর ডোবা নদী নালা
ভরাট হচ্ছে রাস্তাঘাট যত জমি-জলা ।।

একটু বৃষ্টি হলেই পথচলা না যায়
নর্দমা কি রাস্তা সব বোঝা দায়।।

উন্নত হচ্ছি যত আমরা সবাই
হচ্ছি তত প্রকৃতির হাতে জবাই।।

দিতে হবে সকল অন্যায়ের মাশুল
নেই তো তাতে একটুও নির্ভুল।।

কবিতা ও ছড়া

প্রতীক্ষা

কার্তিক পাত্র

শরতের প্রথম হিমেল বাতাসের মতো
হুট করে একদিন দরজা খুলে
তোমার নিঃশর্ত কামনাহীন
এক চিলতে ভালোবাসা
হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল
আমার অলিন্দের বাম প্রকোষ্ঠে।

এখন উচ্ছসিত হৃদয়ের
প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দুয়ার খোলা রাখি
প্রতিদিন,প্রতিক্ষণ
অপেক্ষা করি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত
শুধুমাত্র অতিথি হয়ে নয়
আত্মার আত্মীয় হয়ে আসার প্রতীক্ষায়।

সমান্তরাল

মোনালিসা সাহা দে

যে পাখিটি খোলা চুলে
নীল আকাশে খুঁজে ফেরে তার মনের চিলেকোঠা
যে গাছটি শূণ্য পথপানে চেয়ে
অপেক্ষা করে সেই হারিয়ে ফেলা নূপুরধ্বনির,
তাদের দুজনের চাওয়া যেন
এ জীবনে কোনো একদিন এসে এক জায়গায় মিলে যায়

তীব্র রোদ্দুরে ধূ ধূ করা
ইনবক্স পূর্ণ হোক
বাংলা-ইংরেজি মেশানো খিচুড়ি বাংরেজি ফন্টে,
দুই ঠোঁটের মুক্ত হাসির যুগল সঙ্গীতে
লজ্জা পাক কুহুধ্বনি

উপর থেকে কেউ একজন যেন
নীচে তাকিয়ে দেখে বুঝে উঠতে পারে-
সমান্তরাল দুই রেখারও কখনো কখনো
মিলে যাওয়া বড্ড দরকার!

ঐসব শৈশব

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

পুজো আসে আগমনী পুজো পুজো গন্ধে
ভরে মন ভরে প্রাণ তাল সুর ছন্দে।
শরতের প্রকৃতি যে মোহময়ী অপরূপ
রঙ রূপ গন্ধে-তে নির্বাক নিশ্চুপ।
মাঠে ফোটা কাশফুল মাথা নাড়ে হাওয়াতে
সুমধুর আবেশের ছোঁয়া তারে পাওয়াতে।
রাতে ঝরা শিশিরের লাখো কোটি বিন্দু
সকালের আলো মেখে মুক্তোর সিন্ধু!
আগমনী সুরে হাসে নীলাকাশে সাদা মেঘ
উড়ে যায় দূরে যায় কেহ নাহি রোধে বেগ!
থোকা থোকা শিউলির সুবাসিত আঘ্রাণ
মিঠি মিঠি বাতাসেতে মিশে ভরে মন প্রাণ।
দশভূজা দুগগা-র দশ হাতে বরাভয়
বাজে কাঁসি বাজে ঢাক অসুরের পরাজয়।
অগণিত মানুষের মুখরিত কলরব
তারই মাঝে প্যান্ডেলে খোঁজে মন - শৈশব!
সেই প্যান্ট জামা জুতো খুশি মাখা অনাবিল
কি পরম যতনের হেসে ওঠা খিলখিল!
চশমার ঝাপসায় আমি নেই আমাতে
প্যান্ডেলে ছোটাছুটি নেপু নীলু রামা-তে!
ঐ আসে বীনু বেনু শুকো রিকি ভাবি তা'য়
যেন আজো ডাক দেয়- আসকিম খাবি আয়!
আলমারি ভরা যত খাতা পেন
বই সব-
আবেগের স্মৃতি-ভারে ফিরে আসে শৈশব!
ছোটাছুটি মজা লুটি' অহরহ আড়ি ভাব
নিরূপম ভালোলাগা হৃদয়ের সুখ লাভ!
আধুনিক ছোঁয়া লাগা কত আলো বৈভব
খুঁজে ফেরে মন তবু সোনাঝরা শৈশব !!

কবিতা ও ছড়া

মায়াটান বড়

জয়শ্রী সরকার

ওই যে পাখি উড়ছে দেখো নীল আকাশের মাঝে
সারাটাদিন ঘুরে ঘুরে ফিরবে নীড়ে সাঁঝে।
চঞ্চুপুটে লয়ে খাদ্য পাখির ফিরে আসা
মায়ার বাঁধন এমনিতরো গভীর ভালোবাসা !

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে যায় পাখির কলতানে
দল বেঁধে সব সুর যে ছড়ায় মিষ্টি-মধুর গানে।
ছোট্টবেলার জলছবি সব চোখের সামনে ভাসে
মন-পাখিটা ঠিক উড়ে যায় আনন্দ-উল্লাসে !

প্রাণ-পাখিটা উদাস মনে ভাবছে বসে একা
ডাকছে আমায় দূর-বহুদূর তোর কী পাবো দেখা ?
মায়ার বাঁধন এ-সংসারে মন যে কেমন করে
যাবার কথায় প্রাণ-পাখিটা ডুকরে কেঁদে মরে !

বিহঙ্গকে বলছি ডেকে অন্ত্যমিলটা খেলি
মায়ার বাঁধন অটুট রেখে সঠিক দানটা ফেলি।
পাখনা মেলে যতই উড়ি দূর আকাশের পানে
দুঃখ-সুখে জীবন গাঁথা মন যে পিছু টানে !

মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে সত্যি যেতে হবে
ছোট্ট জীবন 'আমার আমার' করছি কেন তবে?
পক্ষীজীবন চরৈবেতির মায়ার বাঁধন বড়
ছাড়তে হবেই, তাই তো এ-বুক কাঁপছে থরো থরো !

আমার শহর কাঁদে মধ্যরাতে

বিপাশা সমাদ্দার

রাত গভীর হয় শহরের বুকে
তারারাও ব্যথিত হয় পৃথিবীর ব্যথায়।
জেগে থাকে শুধু দুনয়ন -
অনবরত শব্দ খুঁজে চলে মন ;
কখনো পায় , কখনো হারায় , কখনো বেবাক বোকা বনে যায় ;
রঙমঞ্চের কুশলীদের দেখে জীবন ভর অসাড় মন ।

তবুও এ মন জেগে থাকে
শহর ঘুমিয়ে পড়ে রাতের কোলে রাত নামলে পরে।
অথচ আমার ক্লান্ত কলম
শব্দ খুঁজে যায় রাত ভোর হয়ে আসে ।
আমার গল্পে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী আসে না আর মাঝরাতে
আমার শহর অলীক সুখের স্বপ্ন দেখে প্রেমিকার সাথে
একলা ঘরে অদেখা ভুবনের স্বপ্ন ভাঙি তখন নিজের হাতে -
এ মন স্বপ্ন দেখে না আর কোনো রাতে
এ মন শোনে মানুষের কান্না নিশীথ রাতে
এ মন দেখে ক্ষুধাতুর রমণীর রমণ রাতের আঁধারে
এ মন শোনে শোষকের করাঘাত গভীর রাতে
ক্লান্ত শহর সব দেখে বোবা দৃষ্টিতে ;
এ সমাজ তবুও ঘুমিয়ে থাকে কাল চক্রের অন্তরালে।
সত্যের নাগপাশে ক্লান্ত দেহ শান্তি খোঁজে
তবুও জীবন চলে আপন পথে -
যতো দিন না মৃত্যু এসে নৌকা ভিড়োয় এ ঘাটে ;
রাত গভীর হয় ,
শহরের চোখে ঘুম আসে
শুধু এ পোড়া চোখে আবার কেনো জল আসে ?

রাতের জন্য

সৈয়দ আতাউর রহমান

প্রাণ কেঁপে উঠলো
আলোর পিপাসায় ,
অন্ধকার ছুঁয়ে আছে
প্রতি টি রূপের
আমন্ত্রিত বুক,
এসো, জীবন তীর্থে একটি
প্রদীপ জ্বালি
বিশুদ্ধ রাতের জন্য।।

কবিতা ও ছড়া

রাক্ষুসে রিল

তন্ময় অধিকারী

আজকের শিশু কাজলা দিদির খোঁজ নেয় না,
কাঠবেড়ালীর থেকে পেয়ারা চায় না।
খবর নেয় না মৌমাছির ব্যস্ততার।
বিশ মিনিটের কার্টুনেও অধৈয্য।
নতুন সংকট রিল ভিডিও।
ক্রমাগত পরিবর্তীত চলমান ছবি।
একটার পর একটা।
দুরন্তপনা,বায়না সব উধাও,
স্বস্তি পেল ব্যাস্ত পিতা-মাতা।
নিজেদের সব কাজ চলল,
বাচ্চার মনোমুগ্ধকর,অস্বাস্থ্যকর,
নগ্ন-অর্ধনগ্ন,কটুক্তি,অশালীন বাচনভঙ্গী।
বন্দে ভারত রেলের গতি মনের অন্তরালে।
ব্যস্ততায় নাজেহাল জানি,
তবে ওই যন্ত্র নয়,
বই দাও,ছিড়ুক,নষ্ট করুক।
বোধগম্য হবে না হয়তো বইের ভাষা।
দেখুক ছবি,তৈরী হোক বই পড়ার নেশা।
বাঁচাও ওদের,রিল নামক রাক্ষসের হাত থেকে।

আগুন ও বৃষ্টি

সুপ্রভাত মেট্যা

সকালের দিকে বেলায়
ধুলো উঠে আসে সবে। আলো হয়।
খেলার দিন শুরু হয়
হাঁটা থেকে ক্রমশ দৌড়ের দিকে জোর।
ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে দুপুর।
দুগ্ধ আর গোলাপ ঠোঁটের গল্প বেড়ে ওঠে শরীরে।
আবহ আরোগ্যের সংযোগ-সুখ,
সে এক সাংগীতিক নতুন সন্ধ্যা
শুরু হয় বুকের ভিতর।
বাইরে নির্জন পথ।
ধূ-ধু প্রান্তর।
এলোমেলো ধুলো উড়ে যাওয়া বিকেল।
ভেবোনা,
এত বড় খারাপের দেশে
গুলিগোলা আর গালিগালাজ মেখে
গ্রীষ্মে তাপ বেড়ে উঠলে
তোমার শরীর আগুন,
মানে বৃষ্টি আসবেই!

সময় অসময়

আনন্দ গোপাল গরাই

সময়ের বাঁধা ছক মানেনা জীবন
অসময়ের সাথে তার মিতালি অনেক।
সময়েতে সূর্য উঠে পুবের আকাশে
অস্ত যায় গোধূলি বেলায় ছড়িয়ে আবির রঙ
তবু মাঝে মাঝে ঢাকে তারে ঘন কালো মেঘ।
রাতের চাঁদ তারকারাও মুখ লুকায় অসময়ে,
গ্রাস করে 'ভিলেন মেঘ' রূপালি জোৎস্নায়।
সময়েতে বয়ে যায় যে বসন্ত বায়
ফুল ফোটে পাখি ডাকে অপূর্ব সুস্বরে---
সে বাতাসই ঝড় হয়ে লণ্ডভন্ড করে সবকিছু,
নীড় ভাঙ্গে গাছ ভাঙ্গে ঝরায় ফুল ফল।
ধ্যানমগ্না তাপসীর মতো
আপনমনে বয়ে চলে নদী কুলুকুলু রবে;
অকালের বরিষণে রূপ ধরে রাক্ষসীর মতো
কূল ভাঙ্গে বাঁধ ভাঙ্গে ভাসায় ফসল।
প্রকৃতির নিয়ম এই---
জীবনও তো তাই!
সময় অসময়ের দ্বন্দে পূর্ণ হয় মানব জীবন ---
একপেশে জীবনের মাধুর্য কোথায়!

খোঁকার রেস্টুরেন্ট

গোবিন্দ মোদক

তোমার আমার প্রেম এখন
সামাজিক মাধ্যমে ভেসে বেড়ায়,
ঐ লোকে যাকে সোস্যাল মিডিয়া বলে !
কেউ কেউ আরও একধাপ চড়ে বলে ,
ভাইরাল ! ভাইরাল হয়েছে!!
তা হোক বা নাই হোক
আমি-তুমি তেমন কিছু বুঝি না।
কেন না আমি নিতান্তই খোঁড়া,
আর তুমি নিরেট অন্ধ !
অথচ স্বাভাবিক কোনও ভিক্ষের ঝুলি
হাতে না তুলে নিয়ে
আমরা একটা রেস্টুরেন্ট চালাই
লোকে যার নাম রেখেছে খোঁকার রেস্টুরেন্ট !
আজ্ঞে হ্যাঁ, খোঁকা বানানটা সঠিকই আছে।
কেন না খোঁড়া আর কানার
আদ্যক্ষর নিয়েই তার সৃষ্টি।

কবিতা ও ছড়া

একাকীত্ব

মলয় সরকার

আমরা যেন এক চরম গ্রীষ্মের মত
অন্ধকার একাকীত্বের মধ্যেই হাঁটছি সবাই,
সামনে পিছনে চারপাশে ঘন নীল সমুদ্রের
নিঃসঙ্গ নাবিকের মত -
গ্রীষ্মকাল আসে যায় জলকল্লোলের ধারায়
পড়ে থাকা একাকী মন্দিরের
দেওয়াল লিখনের মত-
বানভাসি মানুষ ভেসে যায়
অগাধ নদীজলে,
নিঃসঙ্গ দুপুরে ডেকে যায় একাকী ডাহুক,
শব্দব্রহ্ম মিশে যেতে যেতে ফিরে চায়
উৎসারণ মুখে,
একটি নরম বুকের কোমল অন্তঃস্থলের খোঁজে
ডুব দিচ্ছি অতল সমুদ্রের গভীরে।
হারিয়ে যাচ্ছি নিশছিদ্র অন্ধকারে।
তবু আমরা কি ট্যাণ্টালাসের কাপের মত,
অথৈ সমুদ্রের বুকে
এক গণ্ডুষ তৃষ্ণার জলও পাব না তৃষ্ণার্ত গলায়-
সব কিছুর মধ্যেও আমরা
পথ হাঁটতে থাকব একাকীই!

কতখানি আগুন লাগলে

চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী

আজ আর কোন কবিতা লিখব না
নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম নিরবতার ভেতর,
কোন পাখির গান আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না
সোনালি ধানের উপর শিশির বিন্দুটির কাছে।
গদ্যের রুঢ়তা থেকে তুলে নেব
কষ্ট সহ্যের ইতিহাস
আর পাড়ায় পাড়ায় যেয়ে বলব
জানো সাপ ছোবলের পর ছোবল বসালেও
আমার কোন যন্ত্রণা হয় না।
শুধু অপেক্ষা করব
আগুন কতখানি বনকে পুড়ালে
মানুষ ছুটে আসে বালতি হাতে।

আরোহণ সংক্রান্ত

গৌতম কুমার গুপ্ত

একটা সুবৃহৎ মহীরুহ পাইলে
শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে পারিতাম
বান্দরের মতো তরতর করিয়া
অথবা নিদেনপক্ষে একটা মই সংগ্রহে থাকিলে
তবে ভয় হয় পিচ্ছিল হইলে কুপোকাত হইতাম

সেই ভাবে অর্জিত হইল না শক্তপোক্ত
ফেলিয়া আসিয়াছি সময়
তাই বলিয়া পুষিয়া রাখি নাই অপশ্বাস
যাহারা করিয়াছে পারিয়াছে করুক সহস্র নির্মাণ
উচ্চতল কিংবা বিলাস ব্যসন
খ্যাতির বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ থাকুক বিত্তপ্রমুখ

গ্রহন করিবে না করিবে ঈশ্বরের অভিপ্রায়
সচেষ্ট রহিব চিরকাল প্রজ্জ্বলনে
ধিক ধিক হইতে আধিক্য ঘটিলে বুঝিব
আহা,স্বপ্রবৃত্তি থাকিলে কিছু তো হইতেই পারে

এ হেন শ্বেত পত্রে লিখিয়া রাখি
বাদামী অনিচ্ছাগুলি
ইচ্ছার পশ্চাতে
যেটুকু কমলা ঐচ্ছিক স্বেদ নিয়োজন
তাহাতেই থাকুক
আমার স্বোপার্জিত শ্লাঘা ও স্বাভিমান

কবিতা ও ছড়া

আত্মরতি

গৌতম ঘোষ-দস্তিদার

দিনভর কত যাত্রী পাবে এমন বরষায়
শেষরাতে ট্রাম ঘণ্টা বাজিয়ে গুমটি ছেড়ে যায়
দারুণ কোনো খবর আসবে , থাকি এমন ভরসায়
আমারও পাতলা ঘুমটি কখন বাষ্প হয়ে যায়

গন্তব্যে পৌঁছে যাবার অনেক আগেই
বুড়ো ট্রামখানি ঠনঠনিয়ে যেমন থেমে যায়
জীবিকার রিলে সমাপ্তি যখন হল যে শেষ দাগেই
জীবন সেখানে কখন জানিনা বুড়ি ছুঁয়ে চলে যায়

বোর্ডিং পাস নিলেও শেষে অনেকের তাই
আকাশে ওড়ার স্বপ্ন তবু শেষেও পূরণ হয়নি
মধ্যবিত্ত পুকুরের ব্যাঙ এখানে বেশির ভাগটাই ;
ইশে্তহারের ফর্দ স্মৃতিতে নদী বুঝি তাই বয়নি

সেখানে জীবন কেবল নিত্যযাত্রী ট্রেনের ছাদে
আকাশচুম্বি স্বপ্নগুলো দিনরাত বসে বিড়ি বাঁধে
শৃঙ্খলার ওই শ্যাওলা সিঁড়ি কবে নেমে গ্যাছে খাদে
একটি মানুষ সমষ্টি ভুলে মত্ত আপন নাদে !

ঝড় বাদলে ছিন্ন দু'জন...

অভিজিৎ পাত্র

বৃষ্টি ভেজা বিকাল
আমারও তো কষ্ট হয়
তোকে ছাড়াই কি হয়েছে শরীরের হাল!

প্রবল ঝড়ে ভেঙেছে যে
কতো পাখির বাসা
কেন এমন ঝড় এলোমেলো তোকে-আমাকে

অসহায় আমি;কোথা তুই?
সত্যিই যেন ঘরছাড়া দুই পাগল প্রেমী
খুঁজছি ত্রাণ, মৃতের স্তূপ !তোকে একটিবার ছুঁই -

ঝমঝম বৃষ্টি,ঝাপসা চোখে
মাথা নত শত বৃক্ষ
আগলে রাখে নদীর বাঁধ আমিও তেমনি তোকে

শান্ত হল মরুবর্নিতা ঝড়
যাক না ভেঙে যা গেছে-
না হয় নতুন করে বাঁধবো দু'জন ঘর...

কথা বল থাকিস না চুপ তুই
স্বপ্ন বুনছি একটু একটু করে রোজ
রাত নেমেছে,দেখ গন্ধ পাচ্ছিস বেল ফুল আর জুঁই!

বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

নারী শিক্ষার দিশা কন্যাশ্রী আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত।
একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প হল কন্যাশ্রী। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।
দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। নির্মল পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

২। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা।

৩। গৃহহীন পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

৪। পরিশ্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান।

৫। বৃক্ষরোপণ ও কেঁচো সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।

৬। জব কার্ড হোল্ডারদের কাজের ব্যবস্থা।

৭। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮। কর্মসংস্থানমুখী স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকার যুবকদের ঋণের ব্যবস্থা করা।

৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

১০। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

সর্বোপরি মানুষের সাথে মানুষের পাশে সর্বক্ষণ বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকার বদ্ধ।

নারায়ণ মোদক
উপ প্রধান

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

অসিত মুদি
প্রধান

গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও প্রতিটি গৃহহীন পরিবারের জন্য বাসস্থানের ও বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দুয়ারে সরকার ও লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহঃ সাদিক
উপ প্রধান

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

প্রধান
দণ্ডীচরণ ঘোষ

ভাস্তাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পাশে

- ❖ মিশন নির্মল বাংলার মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
- ❖ গাছ লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করা
- ❖ সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে সব মানুষকে স্বাক্ষর করা।
- ❖ পানীয় জলের অপচয় রোধ ও বাংলা আবাস যোজনার সার্থক রূপায়ন।
- ❖ শস্য বৈচিত্রকরণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষিকাজ-এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি।
- ❖ কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের সফল রূপায়ন।
- ❖ এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন।
- ❖ পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
- ❖ বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ পাট্টা।
- ❖ সর্বোপরি এলাকা উন্নয়নে সাহায্য করে জনগণকে পঞ্চায়েতমুখী করে তোলা।

সীতা সরেন হাঁসদা
উপ প্রধান

জয়ন্ত পাত্র
প্রধান

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

ধনিয়াখালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্থায়ী মানবসম্পদ সৃষ্টি, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ, ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কৃষি শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বীমা কর্মসূচীর

মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণে পঞ্চায়েত অঙ্গীকার বদ্ধ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

মোম সিদ্ধান্ত
উপ প্রধান

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

সন্দীপ টুডু
প্রধান

ঃঃ শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ঃঃ

ধনিয়াখালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

খোলা মাঠে ও রাস্তাঘাটে মলত্যাগ বন্ধ করতে হবে ▸ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে। ▸ শিশুদের মল শৌচাগারে ফেলতে হবে। ▸ শৌচের পর ও খাবার আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। এই অভ্যাস আপনাকে ৭০ শতাংশ রোগ থেকে মুক্তি দেবে। ▸ গ্রামের পুকুরে গবাদি পশু স্নান করানো ও নোংরা ফেলা বন্ধ করতে হবে। ▸ পানীয় জল বাড়িতে ঢেকে রেখে হাতল দেওয়া মগের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। ▸ আপনি যে জল পান করছেন, সেই জল বিশুদ্ধ কিনা তা নিকটবর্তী জল পরীক্ষাগারে নিয়মিত পরীক্ষা করান। ▸ এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

সোমনাথ সামুই
উপ প্রধান

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

ববিতা সরেন
প্রধান

খবর সোজাসুজি

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ

প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮